HIDE RD.

'F' BLOCK.

SERVICE STATION.

বজ্রাহত বনস্পতি

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগ্‌চি
১৪।১বি ভুবনমোহন সরকার লেন
কলিকাতা

ভাদ্র ১৩৪২

দুই টাকা

প্রকাশক—
শ্রীসুধাংশুকৃষ্ণ বাগচি
১৩।১ বি, কৃষ্ণমোহন সরকার লেন
কলিকাতা

প্রিন্টার—
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ
নিউ সরস্বতী প্রেস
২৫।৩এ শম্ভু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বজ্রাহত বনস্পতি

১

জমিদার কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু নিজের হাতে বাস্তুদেবতা রাধাবিনোদের পূজা করিয়া ভোগ দিয়া ঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া কাছারী-বাড়ীতে যাইতেছিলেন। যাইবার পথে দালানে আসিয়াই দেখিলেন তাঁহার গৃহিণী নিত্যকিশোরী একটি সুন্দর ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েকে কোলে করিয়া তাহার প্রফুল্ল শতদলের মতো মুখখানিতে অজস্র চুম্বন করিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া কৃষ্ণগোবিন্দের মনটিও বাৎসল্যের অমৃতরসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল; তাঁহার মনে পড়িল, সে কতদিন, তাঁহারা এমনি একটি শিশুর জন্য রাধাবিনোদের কাছে কত মানত কত পূজা করিয়াছিলেন; তারপর প্রভুর দয়ায় তাঁহারই চরণধুলার মতো সুন্দর এমনি একটি মেয়ে তাঁহাদের শূন্য কোল ভরিয়াছিল, ব্যাকুল মনের ক্ষুধা মিটিয়াছিল, মরুভূমির সমান বাড়ীতে শিশুর হাসির ফুল ফুটিয়াছিল, কলধ্বনির অমৃতনির্ঝর ছুটিয়াছিল। সে তাঁহাদের তুলসীমঞ্জরী। তুলসীমঞ্জরী এখন বড় হইয়াছে; অনেক খুঁজিয়া পরম বৈষ্ণব হরেকৃষ্ণ

বাবুর সুপুত্র শচীদুলালের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছেন। তুলসীমঞ্জরী এখন পরের হইয়া গিয়াছে; তবু ও তাঁহারা তাহাকে বেশি দিন চোখের আড়ালে রাখিতে পারেন না; সে যে প্রভুর প্রসাদী নির্মাল্যের মতো, তাঁহাদের নিঃসন্তান নিরানন্দ জীবনের প্রথম আশীর্বাদ। তারপর একটি পুত্র তাঁহাদের ঘর আলো করিয়াছে; তাহার রূপে গুণে বিতায় কুল আলো হইবে; হয়ত ত দেশও আলো হইবে। সে তাঁহাদের বংশের দুলাল, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী, সে তাঁহাদের প্রাণের অভিলাষ। আজ গৃহিণীর কোলে সুন্দর শিশুটিকে দেখিয়া নিজের সন্তানদের শৈশবের ছবি কৃষ্ণগোবিন্দের মনে পড়িয়া গেল; মনে হইল, আহা! এমনি আর-একটি শিশু, প্রভু যদি আমাদের দিতেন!

কৃষ্ণগোবিন্দ অগ্রসর হইয়া গিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া বাৎসল্যভরা হাসিমুখে বলিলেন—গিন্নি, এটিকে আবার কোথায় পেলে?

নিত্যকিশোরী সস্নেহে শিশুর মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—আহা! এ আমাদের ও-পাড়ার অখিল মিস্ত্রিরের মেয়ে…কাল এর মা মারা গেছে……

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর মুখের স্নেহার্দ্র প্রফুল্লতা নিমেষ-মধ্যে মুছিয়া গেল, তাঁহার চক্ষুস্থির, তিনি গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন—গিন্নি, ওকে কোল থেকে শীগগির নামাও, তোমার জাত গেল……

নিত্যকিশোরী অকস্মাৎ স্বামীর ভাবপরিবর্ত্তন দেখিয়া ভীত হইয়া বলিলেন—কেন গো, কি হয়েছে ?

—ওকে তুমি কোলে নিয়ে চুমু খাচ্ছ ?

—আহা ! কাল এর মা মারা গেছে ; অতবড় সংসারটায় একটা বিধবা বৌ টিমটিম করছিল, সেটাও টিকল না, এই মাওড়া মেয়েটিকে ভাখে এমন লোক নেই, তাই আমি একে আনিয়ে নিয়েছি……

—কায়েতের মেয়েকে কোলে করে' চুমু খেয়েছ, তোমার জাত গেছে।

নিত্যকিশোরী একটু অপ্রস্তুত হইয়া নিজের কার্য্য সমর্থনের জন্ত বলিলেন—আহা ! মা-মরা মেয়ে কোলে আসবার জন্তে মা মা করে' কাঁদছিল……

—তা যাই হোক, তুমি ওকে কোল থেকে নামাও। ওর পা তোমার গায়ে ঠেকছে, ওর অকল্যাণ হচ্ছে!

শূদ্দ,রের মুখে চুমু খেয়েছ, তোমার জাত গেছে।......
নামাও, নামাও ওকে......

নিত্যকিশোরী ভীত ও ব্যথিত হইয়া তাড়াতাড়ি কোল হইতে শিশুটিকে মাটিতে নামাইয়া দিলেন। শিশুটি কোল হইতে বঞ্চিত হইয়া এবং কৃষ্ণগোবিন্দের ভাবভঙ্গী দেখিয়া ভয় পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হামা দিয়া গিয়া নিত্যকিশোরীর পা ধরিয়া মা মা বলিয়া কেবলি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মিনতি জানাইতে লাগিল। নিত্যকিশোরী একজন ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন—থাকো, একে নিয়ে একটু ঘুলোগে।

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন—ওকে পাঠিয়ে দাও...

—কোথায় পাঠাব?

—যেখান থেকে এনেছ।

—সেখানে ওকে কে দেখবে?

—কৃষ্ণের জীব, কৃষ্ণ তার জন্মে ভাবছেন...

—কিন্তু তাঁর ত একজনকে উপলক্ষ্য চাই। তিনি আমাকেই সেই ভার দিয়েছেন মনে কর না...

—না না, শূদ্দ,রের মেয়ে, তুমি মানুষ করবে কি?

না হয় বামনদাসের বৌকে ডেকে বলে দাও সে মানুষ করুক, খরচ যা লাগে আমরা দেবো...ওকে বাড়ীতে রাখা হবে না, শূদ্দুরের ছোট মেয়ে বাড়ীতে রাখলে বাছবিচার থাকবে না।

নিত্যকিশোরী ক্ষুণ্ণ মনে চোখের জল নিবারণ করিবার জন্ত মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন—তারপর শোন, তোমার জাত গেছে, তুমি ঠাকুরদেবতার, কি রান্নাবান্নার কোনো জিনিস এখন ছুঁয়ো না। তোমাকে অহোরাত্র করতে হবে!—আজ থেকে উপোষী থাকবে; কাল অহোরাত্র উপোষ করে থেকে পঞ্চগব্য খেয়ে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণকে পঞ্চামৃত খাইয়ে তোমার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে? বুঝলে?...ভটচাযি্য মশায়কে ডেকে একটা ফর্দ্দ করিয়ে প্রায়শ্চিত্তের জোগাড় করগে।

নিত্যকিশোরী লজ্জায় অপমানে একেবারে আড়ষ্ট। সমস্ত বাড়ী স্তব্ধ। কেবল কোন্ দূরের ঘর হইতে মাতৃহীন শিশুর আকুল ক্রন্দন একটুখানি স্নেহ ভিক্ষা করিয়া সমস্ত বাড়ীময় মা মা বলিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ নামাবলিখানি ভালো করিয়া গায়ে তুলিয়া দিয়া কাছারী-বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। নিত্যকিশোরী জানিতেন তাঁহার স্বামীর কথা মানেই তাঁহার আদেশ, সে আদেশের কখনো নড়চড় হয় না; একত তিনি স্বামীর আদেশের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিলেন না।

কৃষ্ণগোবিন্দ কাছারী-বাড়ীতে যাইতেই নকুড় ভট্টাচার্য্য তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—রায় মশায়, কি অপরাধে আমাকে একঘরে করবার হুকুম দিয়েছেন?

কৃষ্ণগোবিন্দ সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—তোমার ছেলেকে তুমি বিলেত পাঠিয়েছ।

নকুড় মিনতি করিয়া বলিল—ছেলে বিলেত গেছে তার জন্তে আমার জাত যাবে রায় মশায়?

—তুমি ত তার এই অপকর্মের পোষকতা করছ?

—কি করে পোষকতা করলাম রায় মশায়? আমি কি ঘুণাক্ষরেও জানতাম যে সে বিলেত যাবে? হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, তারপর একেবারে বিলেত থেকে খবর দিলে...

—বিলেত যাবার টাকা পেলে কোথায়?

—পাঁচ শ টাকা সে তার মায়ের কাছ থেকে বাই-সিকেল আর কি কি বইটই কিনবে বলে নিয়েছিল, আর দু তিন শ টাকা তার ঘড়ীচেন বাঁধা রেখে নিমু মুখুয্যের কাছ থেকে ধার করে নিয়ে গেছে শুনছি।

—কিন্তু এখন ত তুমি তাকে মাসে মাসে খরচ পাঠাচ্ছ?

—কি করি রায় মশায়, বিদেশ বিভুঁইয়ে ছেলেটা কি না-খেয়ে মারা যাবে?

—অমন ছেলে মরাই ভালো।

নকুড় ব্যথিত হইয়া বলিল—রায় মশায়, আপনি অক্লেশে যে কথা বলতে পারলেন, আমি বাপ হয়ে তা কি কখনো মনে করতেও পারি?…আপনার অভিলাষ যদি বিলেত যেত…

কৃষ্ণগোবিন্দ হো হো করিয়া এমন ভাবে হাসিয়া উঠিলেন যেন এমন অসম্ভব কথা কেহ কখনো বলে নাই বা শুনে নাই। তিনি বলিলেন—অভিলাষ বিলেত যাবে? তেমন বংশে তার জন্ম নয়। ধরে নাও সে যদি যায়ই, তবে সেদিন থেকে সে আর আমার কেউ নয়!

ইহা শুনিয়া নকুড় আহত পিপীলিকার ন্যায় মরীয়া হইয়া কৃষ্ণগোবিন্দকে দংশন করিবার জন্য বলিল—আচ্ছা দেখা যাবে, ছেলে না যাক, জামাই ত বিলেত গেছে, মেয়ে-জামাইকে কেমন ত্যাগ করতে পারেন!

কৃষ্ণগোবিন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া বলিলেন—মিথ্যেবাদী! ম্লেচ্ছ! তুমি কি সবাইকে নিজের ছেলের মতন পেয়েছ? হরেকৃষ্ণ গোস্বামীর ছেলের নামে এমন অপবাদ দিচ্ছ, তোমার জিভ খসে যাবে না?...

নকুড় দুর্ব্বলের বিজয়ের ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিল—দুঃখিত হলাম রায় মশায়, জিভ খসবে না, আমি মিথ্যে কথা বলিনি। গাঁয়ের অপর লোকে ম্লেচ্ছ বলতে পারে, আপনার মুখে আর ও কথাটা শোভা পাচ্ছে না। আপনার মেয়ে এখনো আপনার বাড়ীতে রয়েছে! আপনি হলেন গিয়ে সমাজপতি, আপনি এখন নিজেকেও একঘরে করুন, আমি একঘরে হয়েছি, আপনাকে দলে পেলে তবু দুঘরে হয়ে থাকব!

কৃষ্ণগোবিন্দ রাগে লজ্জায় অপমানে থমথম করিতেছিলেন। নকুড় নিজের জয়ে উৎফুল্ল হইয়া হাসিতে

হাসিতে বলিল—রায় মশায়, এখানে এসেই যখন শুনলাম যে মাওড়া কায়স্থের মেয়ের চুমু খেয়েছেন বলে' আপনি আপনার গিন্নির প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেছেন, তখনই বুঝেছিলাম যে আমার একঘরে হওয়া রদ হবে না। তবু আপনার অপেক্ষায় বসে ছিলাম আপনাকে এই সুখবরটা শুনিয়ে যাবার জন্তেই। শচীদুলাল বড় ভালো ছেলে, আমায় গিয়ে বিশেষ সহানুভূতি জানালে, আপনার বেশই একটু নিন্দে করলে, তারপর আমায় বল্লে যে, "খুড়োমশায়, এখন কাউকে বলবেন না, শুধু আপনাকে চুপিচুপি বলছি, আমিও যে বিলেত যাচ্ছি, আমার টিকিট পর্য্যন্ত কেনা হয়ে গেছে।" আমি বল্লাম, "তা বেশ বাবা বেশ। যাও যাও, তুমি গেলে আমার পন্টুর তবু একজন চেনাশোনা সঙ্গী হবে।" এতদিনে সে বোধ হয় বিলেত পৌঁছে গেছে। আমি মনে করলাম সুখবরটা আপনার কাছে চেপে রাখা আর ঠিক নয়, তাই আজ শুনিয়ে গেলাম···

কৃষ্ণগোবিন্দ হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—কে আছিস্ রে? এই ভট্চায্যিটার কান ধরে এখান থেকে বার্ করে দে ত······

নকুড় বক্রদৃষ্টিতে ক্রূর হাসি ভরিয়া কৃষ্ণগোবিন্দকে বিদ্ধ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

কৃষ্ণগোবিন্দও আর সেখানে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। একেবারে হনহন করিয়া অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন।

বাড়ীর মধ্যে আসিয়াই ডাকিলেন—তুলসী!

বাপের আদরের মেয়ে তুলসী, বাপের ডাক শুনিয়া হাসিমুখে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া—কেন বাবা?—বলিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল; সে জন্মিয়া অবধি বাপের এমন উগ্র ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি কখনও দেখে নাই; তিনি কাহারো উপর খুব ক্রুদ্ধ হইলে নিত্যকিশোরী তাড়াতাড়ি তুলসীকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিতেন, তুলসীকে দেখিলে তিনি অতিবড় ক্রোধও ভুলিয়া কন্যাকে হাসিমুখে তুলসী তুলসী মঞ্জরী প্রভৃতি কত নামে ডাকিয়া আদর করিতেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ গম্ভীর স্বরে বলিলেন—তুলসী! শচী বিলেত গেছে?

তুলসী পিতার ক্রোধের কারণ বুঝিতে পারিল।

পরম অপরাধীর মতো মাথা নত করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

—এ খবর তুমি যখন জেনেছিলে তখনই আমায় জানাওনি কেন?

তুলসী অতি মৃদুস্বরে মাথা নত করিয়াই বলিল—উনি আমায় বারণ করেছিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—যদি আগে আমায় জানাতিস তবে আমি ওকে যেতে দিতাম না; কথা না শুনত ঘরে বন্ধ করে রাখতাম। তবু যদি পালিয়ে যেত, জানতাম তুই বিধবা হয়েছিস···

তুলসীর চোখ দিয়া টসটস করিয়া বড় বড় ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল। যে স্বামী কত দূর বিদেশে, তাহার অমঙ্গল আশঙ্কায় তুলসীর নারীহৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে জলভরা চোখ দুটি তুলিয়া বাপের মুখের দিকে চাহিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ নিজের ক্ষণিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া বলিলেন—তুই আমার মেয়ে হয়ে জেনে শুনে তোর স্বামীকে বিলেত যেতে সাহায্য করেছিস, আমার উঁচু

মাথা তুই হেঁট করে দিয়েছিস, আমার কুলে কালি দিয়েছিস! আমার এ ঠাকুর দেবতার বাড়ী—এ বাড়ীতে আর তোর ঠাঁই হবে না। শীগগির প্রস্তুত হয়ে নে, পাল্কী আসছে এখনি তোকে যেতে হবে।

বাবা!—ডাকের মধ্যে তুলসী হৃদয়ের সমস্তখানি মিনতি ঢালিয়া দিয়া কৃষ্ণগোবিন্দের পায়ে ধরিতে গেল! তাহার হাত শূন্য মেঝেতে গিয়া পড়িল, কৃষ্ণগোবিন্দ তাড়াতাড়ি সেখান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

নিত্যকিশোরী আসিয়া নীরবে চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে কন্যাকে মাটি হইতে তুলিয়া বুকে করিলেন; তুলসী মায়ের বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—মা, তবে আজ এই শেষ দেখা।

মা কন্যার এই কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। আ-কৈশোর তিনি কর্তার কড়া হুকুমে এমন অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে এতবড় ব্যাপারটাও নীরবে মানিয়া লওয়া ছাড়া তাঁর আর কোনো সাধ্য হইল না।

ক্ষণেক পরেই সমস্ত বাড়ীকে চোখের জলে ভাসাইয়া

তুলসীর পাল্কী অন্তঃপুর হইতে চিরদিনের জন্ত বাহির হইয়া গেল।

বেহারাদের কোলাহল তখনো অন্দর হইতে শোনা যাইতেছিল। কৃষ্ণগোবিন্দকে আসিতে দেখিয়া নিত্য-কিশোরী তাড়াতাড়ি জানালা হইতে সরিয়া আসিয়া চোখ মুছিয়া দাঁড়াইলেন। উচ্ছ্বসিত বেদনা রুদ্ধ রাখিবার দারুণ শ্রমে কৃষ্ণগোবিন্দকে ভয়ানক দেখাইতেছিল। তিনি ঘরে আসিয়াই জোর দিয়া বলিলেন—গিন্নি, তুলসী বলে আমার কোনো মেয়ে ছিল না। কেউ যেন আমার কাছে তার নাম না করে।

নিত্যকিশোরী ফ্যাল ফ্যাল করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার বুকফাটা অশ্রুনির্ঝর স্বামীর হুকুমের পাথর দিয়া চাপা রহিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ পুত্রের ঘরে গিয়া দেখিলেন অভিলাষ টেবিলের উপর হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। কৃষ্ণগোবিন্দ ফিরিয়া দরজা পর্যন্ত আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর আবার ঘরে ফিরিয়া গিয়া ডাকিলেন—অভিলাষ।

অভিলাষ পিতার আহ্বানে বেশি করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল—দিদির জন্য বেদনার সহিত পিতার প্রতি ক্রোধ ও অভিমান তাহার সমস্ত ভিতর বাহির ক্রন্দনের আবেগে কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন—অভিলাষ, তোমার ইংরিজি পড়া আজ থেকে বন্ধ!

অভিলাষ তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া মাথা তুলিয়া বলিল —বি-এ এগজামিনের আর দুমাস আছে......

কৃষ্ণগোবিন্দ গর্জন করিয়া উঠিলেন—চুলোয় যাক তোমার বি-এ এগজামিন। ইংরিজি আর পড়তে পাবে না।

—তবে কি আমি মূর্খ হয়ে থাকব?

—পড়তে হয় সংস্কৃত পড়বে, ভাগবৎ পড়বে। তোমার ইংরিজি সব বই আমি পুড়িয়ে ফেলতে হুকুম দিয়েছি......

বিদ্যুৎবিদ্ধ লোকের মতো অভিলাষ চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। সে আপনার চারিদিকের ব্যাপারটা ঠিক যেন বুঝিতে পারিতেছিল না। কৃষ্ণগোবিন্দ ধীরে ধীরে

সেখান হইতে চলিয়া গিয়া ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া খিল দিলেন। অভিলাষ ছুটিয়া আপনার বইয়ের ঘরে যাইতে গিয়া দেখিল উঠানে রঘু খানসামা প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া তাহাতে তাহার বড় সাধের বইগুলি আহুতি দিতেছে। কর্তার হুকুম!

অভিলাষ নীরবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বই-পোড়া দেখিল; তারপর ধীরে ধীরে আপনার ঘরে গিয়া আড়ষ্ট আকাট হইয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল—যেন পুত্রশোকাতুর পিতা প্রাণাধিক পুত্রকে চিতায় জ্বলিতে দেখিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই কৃষ্ণগোবিন্দ রাধাবিনোদের মন্দিরের সম্মুখে তুলসীমঞ্চের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার হঠাৎ আদেশে রাজমিস্ত্রীরা এই তুলসীমঞ্চটি মার্বেল পাথরে গাঁথিয়া তুলিতেছিল। কৃষ্ণগোবিন্দ বেদনাতুর দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া তুলসীমঞ্চ গাঁথা দেখিতে দেখিতে এক-একবার ফিরিয়া ফিরিয়া রাধা-বিনোদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। বেলা হইয়া উঠিল, মুখের উপর রৌদ্র আসিয়া পড়িল, কৃষ্ণগোবিন্দ ঠায় দাঁড়াইয়া আছেন।

হঠাৎ রঘু খানসামা দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া বলিল—মা-ঠাকরুণ একবার আপনাকে ডাকছেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—এখন যেতে পারব না, যা।

—আজ্ঞে, দাদাবাবু কোথায় চলে গেছেন…

কৃষ্ণগোবিন্দ এক মুহূর্ত্ত রঘুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবিচলিত গম্ভীরভাবে বলিলেন—কি করে জানলি চলে গেছে? কোথাও বেড়াতে যায়নি?

—আজ্ঞে না, চিঠি লেখে রেখে গেছেন। মা-ঠাকরুণ কাঁদতে লেগেছেন…

কৃষ্ণগোবিন্দ একবার একদৃষ্টে রাধাবিনোদের দিকে আরবার তুলসী-গাছটির দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া হঠাৎ সেখান হইতে হন হন করিয়া চলিয়া গেলেন।

অন্দরে গিয়াই নিত্যকিশোরীকে বলিলেন—কৈ, অভির চিঠি দেখি।

নিত্যকিশোরী চোখের জলে অভিষিক্ত অভিলাষের চিঠিখানি স্বামীর হাতে নীরবে তুলিয়া দিলেন

কৃষ্ণগোবিন্দ চোখ বুলাইয়া গম্ভীর হইয়া মনে মনে পড়িলেন—

মা,

মূর্খ হয়ে থাকতে আমি পারব না। আমি বিলেত চললাম। তুমি কেঁদো না। চেঁচিয়ে কাঁদবার হুকুম তোমার থাকবে না, মনে মনেও কেঁদো না! শীগগির আবার তোমার কোলে ফিরে আসব।

তোমার ছেলে অভিলাষ।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন—রঘু, ঘনশ্যামকে ডাক।

দেওয়ান ঘনশ্যাম আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন—ঘনশ্যাম, আমরা এখনই কলকাতা যাব, তার ব্যবস্থা করে দাও।…আমি অপুত্রক হয়েছি… সমস্ত বিষয় সম্পত্তি রাধাবিনোদের নামে দেবোত্তর করতে হবে……

ঘনশ্যাম হাত জোড় করিয়া বলিলেন—আজ্ঞে, অনেক বেলা হয়েছে, খাওয়া দাওয়া…

কৃষ্ণগোবিন্দ বাধা দিয়া শুধু হুকুম করিলেন—যাও, পাল্কী আনতে বলগে···

ঘনশ্যাম তথাপি হাত কচলাইতে কচলাইতে আবার বলিলেন—বৌঠাকরুণ কাল থেকে উপোষী আছেন···

কৃষ্ণগোবিন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া বলিলেন—তা আমি জানি। তোমাকে যা বলছি তাই করগে।···যাও···

আধঘণ্টার মধ্যে দুখানি পাল্কী রাধাবিনোদপুর হইতে বাহির হইয়া গেল। তখনো ষোল জন বেহারার হুমহুম শব্দ রুদ্ধ ক্রন্দনের মতো দূর হইতে গ্রামের মধ্যে ভাসিয়া আসিতেছিল। নকুড় ভট্টাচার্য্য দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া একগাল হাসিয়া সমবেত গ্রামবাসীদের ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—বাবা! বামুনের মন্ত্রি যাবে কোথা, হাতে হাতে ফলে গেল! একজন ভগবান্ ত মাথার ওপর আছেন, এখনো দিন রাত হচ্ছে!

তাহার কথায় কেহ কোন উত্তর দিল না। সমস্ত গ্রাম যেন আজ বাক্যহারা, অপ্রকাশ বেদনায় স্তব্ধ!

২

প্রায় তিন বৎসর পরে অভিলাষ সিভিলিয়ান হইয়া বিলাত হইতে ফিরিয়া হাবড়া ষ্টেসনে নামিল; দেখিল তাঁহার ভগ্নীপতি শচীদুলাল তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াছে, কিন্তু তাহার নিজের বাড়ীর একটা চাকর পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে এতকাল পরে তাহার নিজের বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া যাইবার জন্ত আসে নাই। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শচীদুলালকে জিজ্ঞাসা করিল—গোঁসাইজী, আমাদের কেউ আসেনি?

শচীদুলাল বুঝিল এই প্রশ্নের মধ্যে কতখানি ব্যথা ও অভিমান পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। শচীদুলাল এ প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারিল না; যেন সান্ত্বনা দিয়া একথা ভুলাইয়া দিবার জন্তই বলিল—তুলসী তোমার জন্তে ব্যস্ত হয়ে অপেক্ষা করছে, এস চটপট গাড়ীতে উঠে পড়।

অভিলাষ গাড়ীর খোলা দরজার সামনে দাঁড়াইয়া

দাঁড়াইয়া গাড়ীর মাথায় পোর্টম্যান্টো বিছানা বাক্স ব্যাগ বোঝাই করা দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিল তাহার বাড়ীর কথা। তাহার পিতা যে তাহাকে না দেখিয়া দশ দিন থাকিতে পারিতেন না ; একবার অভিলাষ বৈদ্যনাথে বেড়াইতে গিয়া তাঁহাকে একদিন চিঠি দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহার পিতা জবাবী টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন ; দশদিন পরে নিজে বৈদ্যনাথে ছুটিয়া গিয়া পুত্রকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলেন ; অভিলাষের একদিন একটু অসুখ হইলে তাঁহার নাওয়া খাওয়া বন্ধ হইয়া যাইত, রাধাবিনোদের পূজা পর্য্যন্ত হইত না। তাঁহার সেই অভিলাষ কত দূরের নির্ব্বান্ধব দেশে একাকী অসহায় নিঃসম্বল চলিয়া গিয়াছিল, তাঁহারই উপর অভিমান করিয়া ; কিন্তু তিনি এক দিনের তরেও তাহাকে একটি কুশলপ্রশ্নও জিজ্ঞাসা করেন নাই ; তাঁহার বিপুল বিত্তের সিকি পয়সাও তাহাকে পাঠান নাই ; অভিলাষ যে-সমস্ত চিঠি তাঁহাকে বা তাহার মাকে লিখিত সে-সবগুলিই অমনি না খুলিয়াই ফেরত যাইত। সে আজ এতকাল পরে বাড়ী ফিরিতেছে বলিয়া সংবাদ দিয়া পিতাকে পোষ্টকার্ডে চিঠি

লিখিয়াছিল, কিন্তু সে চিঠিও হয়ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। এই তিন বৎসর তাহার ভগ্নীপতিই তাহার বিদেশে পড়ার খরচ চালাইয়াছে; আজ সে-ই তাহাকে তাহার দিদির কাছে আদর করিয়া ডাকিয়া লইতে আসিয়াছে—তাহার দিদিও তাহারই মতন মাতাপিতার স্নেহস্বর্গ হইতে বিতাড়িত, সে-ই তাহার দুঃখ বুঝিয়েছে।

শচীদুলাল অভিলাষের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—অভি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছ কি? উঠে পড়। তুলসী রেঁধে-বেড়ে খাবার নিয়ে তোমার জন্যে বসে রয়েছে…

অভিলাষ একবার চারিদিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গাড়ীর পাদানে পা দিয়া গাড়ীতে উঠিতে গেল; আবার পা নামাইয়া লইল। শচীদুলালের দিকে ফিরিয়া বলিল—গোঁসাইজী, আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারব না। আমি মার কাছেই যাব।

শচীদুলাল বলিল—তুলসী…

—দিদিকে বোলো তার সঙ্গে শীগগিরই দেখা করব…

—কিন্তু মার সঙ্গে দেখা করতে পাবে কি?

—না পাই তখন দিদির কাছেই ফিরব।

শচীদুলাল দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিল—তবে যাও, একবার দারোয়ানের ধাক্কা খেয়ে ঘুরে এস ; আমি যাই, গিয়ে তোমার খাবার-দাবার ঠিক করিয়ে রাখিগে !

অভিলাষ একখানি ঠিকা গাড়ী ডাকিয়া তাহার মাথায় আপনার জিনিসপত্র চাপাইয়া আবাল্যের স্নেহনিকেতন, পিতামাতার কোলের মতন আপন বাড়ীতে ফিরিয়া চলিল।

প্রকাণ্ড ফটক পার হইয়া বাগানের বাঁকা রাস্তা ঘুরিয়া গাড়ী আসিয়া গাড়ীবারান্দায় দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই অভিলাষ স্ফূর্তি মুখে শুক হাসি টানিয়া স্পন্দিত বুকে গাড়ী হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। সম্মুখেই ইনাম সিং জমাদারকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—জমাদার, সব ভালো ত ? বাবা কোথায় ?

জমাদার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ভিতর হইতে কৃষ্ণ-গোবিন্দবাবু হাঁকিয়া বলিলেন—ইনাম সিং, ভিতরে কেউ যেন না আসে !

অভিলাষ থমকিয়া দাঁড়াইল। দেওয়ান ঘনশ্যাম তাড়া-তাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—বাবা, কর্ত্তার মত

ত তুমি জানো; এ বাড়ীতে তোমার থাকা স্থবিধে হবে না, বলতে বললেন।

অভিলাষ বলিল—ঘনশ্যাম কাকা, আমি বাড়ীর ছেলে, এই বাড়ীতে নইলে কোথায় থাকব? আপনাদের বাড়ীতে মোছলমান কোচমান সহিসও ত আছে, তাতে ত আপনাদের বাধে না; আমি থাকলেই কি বিশেষ অন্যায় হবে?

ঘনশ্যাম ভিতরে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—কর্ত্তা বললেন, তা তুমি যদি কোচমান সহিসদের মতন থাকতে পার তাহলে আস্তাবলের একটা ছোটো ঘর তোমাকে খালি করে দেওয়া যেতে পারে।

এমন উত্তর অভিলাষ আশা করে নাই। সে অপমানে স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া এক লাফে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল এবং সশব্দে গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া জোরে কোচমানকে বলিল—চলো, গোলতালাও চলো।

অভিলাষের গাড়ী যেমন মোট মাথায় করিয়া আসিয়াছিল আবার তেমনি মোট মাথায় করিয়া বাগানের বাঁকা রাস্তা ঘুরিয়া ফটক পার হইতে চলিল। গাড়ীবারান্দা হইতে বাহির হইতেই উপরকার জানালায় অভিলাষের

চোখ পড়িল ; অভিলাষ দেখিল তাহার মা তাহাকেই একটিবার দেখিবার আশায় চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে জানালায় আসিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহাকে দেখিয়া লইবার জন্ত দুইহাতে তিনি ঘন ঘন অশ্রুজাল সরাইয়া সরাইয়া দিতেছেন, কিন্তু তখনই আবার অশ্রুজাল দৃষ্টি বাপ্সা করিয়া তুলিতেছে।

অভিলাষ গাড়ীর জানালা দিয়া অর্দ্ধেক শরীর বাহির করিয়া হাঁকিয়া বলিল—কোচমান, গাড়ী ঘুমাও, গাড়ী রোকো!

গাড়ী আবার গাড়ীবারান্দায় আসিয়া লাগিল। অভিলাষ নামিয়া পড়িয়া বলিল—ঘনশ্যাম কাকা, আমি আস্তাবলেই থাকব, আমি এ বাড়ী ছেড়ে যেতে পারব না।

ঘনশ্যাম আবার বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। ক্ষণেক পরেই কোচমান সহিস প্রভৃতি মুসলমান ভৃত্যেরা আসিয়া অভিলাষকে সেলাম করিয়া গাড়ী হইতে জিনিসপত্র নামাইতে লাগিয়া গেল, এবং ঘনশ্যাম ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—বাগানের মধ্যে মালীর ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কর্ত্তা বল্লেন যতদিন এ বাড়ীতে

থাকবে হিন্দু চাকর তোমাকে নিরামিষ খাবার দিয়ে আসবে, ম্লেচ্ছের ছোঁয়া অখাদ্য খেতে পাবে না।

অভিলাষ বলিল—ঘনশ্যাম কাকা, একবার বাবাকে মাকে প্রণাম করতে পাব না?

—পাবে বৈকি বাবা, পাবে বৈকি। এখন মুখহাত ধুয়ে একটু জিরিয়ে টিরিয়ে কিছু খাও টাও, তারপর সে হবে'খন।

—না কাকা, প্রণাম না করে আমি কিছু খাব না।

ঘনশ্যাম যেন বিপদে পড়িয়া ইতস্তত আমতা-আমতা করিতে লাগিলেন। অভিলাষ তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া কহিল—যে দরজা দিয়ে মেথরাণী অন্দরের উঠান পরিষ্কার করতে যায়, সহিস দানা আনতে যায়, আমি সেই দরজা দিয়ে উঠানে গিয়ে দাঁড়াব; বাবা মা রকের উপর দাঁড়াবেন, আমি দূর থেকে প্রণাম করে চলে আসব।

অভিলাষ উঠানে গিয়া দাঁড়াইতেই কৃষ্ণগোবিন্দ মুখ ফিরাইলেন; অভিলাষের মাতা অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; অভিলাষ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

ক্ষণেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অভিলাষ বলিল —মা, বড় খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও।

মা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন— তুই বাইরে যা, খাবার এক্ষুণি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অভিলাষ বলিল—মা, তোমার হাত থেকে প্রসাদ না পেয়ে ত যাব না। এইখানে আমায় একখানা পাতা দাও।

অভিলাষ উঠানে মাটীতে বসিয়া পড়িয়া বলিল— তুমি ওপর থেকে আলগোছা খাবার ফেলে ফেলে দিয়ো, আমি খেয়ে গোবর দিয়ে ঠাঁই পরিষ্কার করে দিয়ে যাব।

ঘনশ্যাম বলিলেন—ছি বাবা, পাগলামি করে না। বাইরে চল, তোমার সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি...

অভিলাষ নড়িবার নামও করিল না। নীরবে মায়ের মুখের দিকে চাহিল। তাহার মাতা কর্ত্তার দিকে চাহিলেন। কর্ত্তা মুখ ঘুরাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কর্ত্তা বারণ করিলেন না দেখিয়া নিত্যকিশোরী বলিলেন—ওলো ও মাধি, যা যা বগ করে' একখানা পীঁড়ি আর একখানা পাতা নিয়ে আয়, আর বামুনদিদিকে

বলগে তাঁড়ারঘরে আমি খাবার সাজিয়ে রেখে এসেছি, চট করে নিয়ে আসবে।

চাকর দাসী দাদাবাবুর খাবারের আয়োজন করিতে চারিদিকে ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল।

পীঁড়ি দেখিয়া অভিলাষ বলিল—আমার পীঁড়ি চাইনে। আমি বেশ বসেছি।

নিত্যকিশোরী বলিলেন—পীঁড়িখানা টেনে নে না, ও ত ধুয়ে গঙ্গাজল দিয়ে নিলেই শুদ্ধ হবে।

—না মা, পীঁড়ি থাক। তুমি চট করে খাবার দাও, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

মা দূর হইতে আলগোছে সন্তর্পণে তাহাকে খাবার দিতে লাগিলেন; অভিলাষ আহার করিল। তারপর মাটির গেলাস ও পাতাখানি তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া আসিয়া বলিল—আমায় একটু গোবর দাও।

নিত্যকিশোরী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—না না, গোবর দিতে হবে না, ও শকড়ি থাকগে, কাল মেথরাণী ধুয়ে দিয়ে যাবে।

অভিলাষ বলিল—এখানটা নোংরা হয়ে থাকলে যাজে আবার খাব কোথায় ?

ঘনশ্যাম বলিলেন—একবার খেলে, হল ; বার বার এই রকম করবে নাকি ?

—হাঁ কাকা, জানেন ত মা কাছে বসে না খাওয়ালে আমার খাওয়া হত না। এতকাল পরে আমি মার কাছে ফিরে এসেছি।

অভিলাষের মা আবার অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ঘনশ্যাম বলিলেন—এ রকম করলে লোকে বলবে কি, যে, একজন ম্যাজিস্ট্রেট রোজ গোবর ঘাঁটছে। আজকে ত সময় নেই, কালই প্রায়শ্চিত্তের জোগাড় করে' দেবো……

অভিলাষ বলিল—আমি ত কোন পাপ করিনি কাকা যে প্রায়শ্চিত্ত করব ? ম্যাজিস্ট্রেট গোবর ঘাঁটলে লোকে নিন্দে করবে, অথচ ম্যাজিস্ট্রেট গোবর খেলে লোকে খুব ভালো বলবে, না ? গোবর খেতে আমি পারব না কাকা।

তাহার মা বলিলেন—রোজ দুবেলা এই গোবর ঘাঁটার চেয়ে কি একদিন চোখকান বুজে গোবর খাওয়া ভালো

নয় রে? তুই যে গোবর দেখে সেঁটকাচ্ছিস; এখন রোজ গোবর ছুঁবি কেমন করে বল্ ত? তার চেয়ে প্রাচিত্তিরটা করে ফ্যাল।

অভিলাষ বলিল—মা, এই ত আমার প্রায়শ্চিত্ত! আমি তোমাদের অযত্নে কাজ করে' অপরাধ করেছি; তোমাদের কাছে আমি শতেকবার খাটো হব। কিন্তু অপরের জুলুমের কাছে আমার মাথা নুইবে না মা!... মাধি আমায় একটু গোবর দে।

মাধি সকলের মুখের দিকে একবার তাকাইল। কেহই কোনো কথা বলে না দেখিয়া অভিলাষের সম্মুখে একটু গোবর ফেলিয়া দিল। অভিলাষ সমস্ত শরীরকে সঙ্কুচিত করিয়া প্রাণপণ ইচ্ছায় গোবর তুলিয়া লইল। সে যেমন তাহা মাটিতে মার্জ্জনা করিতে যাইবে অমনি তাহার মাতা উঠানে নামিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার হাত ধরিলেন! তারপর পুত্রকে বুকে টানিয়া তুলিয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে তাহার মুখে শত চুম্বন দিয়া যেন তাহার সকল অপরাধ, সকল গ্লানি মার্জ্জনা করিয়া দিতে লাগিলেন।

বাড়ীর সকলে অবাক, সমস্ত বাড়ী স্তব্ধ।

কৃষ্ণগোবিন্দের খড়ম খুব কড়া রকমে খটর খটর করিয়া ডাকিয়া উঠিল। তিনি খড়ম খটখট করিতে করিতে উপস্থিত হইয়া গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—গিন্নি! তোমার একি মতিচ্ছন্ন হল! তোমাকেও আমি ত্যাগ করিলাম।

নিত্যকিশোরী উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—তাই করো গো, তাই করো। আমার বুক এতদিন দুঃখে ফেটে যাচ্ছিল; তুমি ত্যাগ করো আমায়, আমি ছেলে মেয়েকে বুকে করে' জুড়োব!

কৃষ্ণগোবিন্দ ডাকিলেন—ঘনশ্যাম, শীগ্গির ব্যবস্থা কর গে, রাধাবিনোদকে নিয়ে এখনই আমি বৃন্দাবন যাব।

রঙের ছোপ

সদ্য বিবাহের পর সান্ত্বনা ও সুবিমল অরসিকের আনাগোনার ভয়ে একেবারে পরিচিতের রাজ্য ছাড়িয়া সটান ভুটানে পলায়ন করিয়াছে। সেখানে তাহারা এ উহার সঙ্গী, তাহাদের অবিচ্ছিন্ন মিলনের মধ্যে কোনো সংপ্রসঙ্গ আলোচনায় উপদ্রবের ভয় কিছুমাত্র নাই। তাহারা দুজনে ডাণ্ডিতে চড়িয়া পাহাড়ীদের কাঁধে কাঁধে একস্থান হইতে অপরস্থানে নিজেদের ডেরা-ডাণ্ডা নাড়িয়া বেড়ায়—দুদিন কোথাও স্থির হইয়া থাকে না; ভয়, পাছে কেহ আলাপ জমাইয়া শেষে তাহাদিগকে পাইয়া বসে।

একদিন এক গ্রামে গিয়া শুনিল সেখানে একটি বাঙালী আছে। বাঙালীর নামে সুবিমল চমকিয়া উঠিল। সান্ত্বনা বলিল—আর এক দণ্ড এখানে থাকা নয়! সর্ব্বনাশ! অবাঙালীর দেশে বাঙালীর কবলে পড়ার চেয়ে বাঘের কবলে পড়িলেও রক্ষার তবু সম্ভাবনা আছে!

পাহাড়ীরা বলিল—ভয় নাই ; সে ভকত মানুষ, মৌনী, রাতদিন দেবী-পূজন করে, কখনো কাহারো সহিত একটিও কথা বলে না।

সাধনা ও হরিমল আরামের নিশ্বাস ফেলিল। কিন্তু সাবধানের মার নাই মনে করিয়া সেখানে না থাকাটাই স্থির করিল। সেই ভুটানীদের দেশে নির্বাসিত বাঙালী বেচারা বাধ্য হইয়াই হয়ত মৌনী হইয়াছে ; বাঙালী দেখিলেই তাহার এতকালের বেকার রসনা বশ না মানিতেও পারে চাই কি।

ভুটানীরা কিন্তু উত্তর দিল যে সে বাঙালী বটে কিন্তু ভারী সাধুপুরুষ ! রাতদিন দেবী-পূজন করে, ঘর হইতে বাহির পর্য্যন্ত হয় না উহাকে তাহারা মৌনী ভকত বলে। এই মৌনী ভকতকে একবার দর্শন না করিয়া বাবু সাহেবের যাওয়া হইতেই পারে না।

হরিমল বড় বিপদেই পড়িল। হতভাগ্য বাঙালীটা মরিবার আর জায়গা পায় নাই।

সাধনার কৌতূহল হইতেছিল। বলিল—চলই না একবার দেখেই আসি, এত করে এরা বলছে।

দেখবে আর কি ছাই! ছাই ভস্ম মেখে জটা পাকিয়ে বসে আছেন এক বুজরুক; বোমার মামলার ফেরারী অসামী টাসামী হবে। ভেড়াগুলোকে ঠকিয়ে দিব্যি সুখে স্বচ্ছন্দে খাচ্ছে দাচ্ছে আছে।

তবু চল একবার দেখাই যাক।

মরীয়া হইয়া সুবিমল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল —চল।

একখানি পর্ণকুটিরে ঢুকিয়াই সুবিমল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—এ যে তোমার ছবি!

একখানি প্রমাণ-সই চিত্রকে পাহাড়ী ফুলের অঞ্জলিতে অঞ্জলিতে সাজাইয়া একটি লোক একদৃষ্টে সেই চিত্রের আনন্দময়ী সুন্দরীর মুখের দিকে তাকাইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। সুবিমলের চীৎকারেও তাহার ধ্যানভঙ্গ হইল না।

সান্ত্বনা সুবিমলের হাত ধরিয়া বিষণ্ণ মৃদুস্বরে মিনতি করিয়া বলিল—চলে এস।

ও সেই বোবা চোরটা!

এস তুমি।—সান্ত্বনা সুবিমলের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল।

এত গণ্ডগোলেও মৌনী ভক্তের অপলক দৃষ্টি ছবি ছাড়িয়া একবারও ফিরিয়াও তাকাইল না যে তাহার দ্বারে আসিয়া কে আবার চলিয়া গেল।

সান্ত্বনার যখন বিবাহ স্থির হইল তখন তাহার বাবা শ্রীমন্ত বাবু তাঁহার একমাত্র কন্যাকে পরের ঘরে বিদায় দিবার আগে তাহার একখানি প্রমাণ-সই অবিকল ছবি আঁকাইয়া লইবার সঙ্কল্প করিলেন। চিত্রকর যে নিযুক্ত হইল সে কালা বোবা। বিবাহের আর চারমাস মাত্র দেরী আছে; তিনমাসে ছবি শেষ করিয়া দিতে হইবে। রোজ পাইবে সে দশ টাকা।

বোবা চিত্রকর রোজ আসে; ইজেলের সামনে টুলে বসিয়া একদৃষ্টে সান্ত্বনাকে দেখে, আর নরম তুলিতে পটের উপর রঙের পর রং বুলাইয়া তাহাঁর রূপ, কলিকা হইতে ফুলের মতো, অঙ্গে অঙ্গে সুষমা সৌন্দর্য্যে ভরিয়া ফুটাইয়া তোলে। সান্ত্বনার পায়ের কাছে কাত হইয়া বসিয়া বসিয়া

অবিরাম বকিয়া যায় সুবিমল এবং থাকিয়া থাকিয়া সান্ত্বনার মুখে খেলিয়া যায় ক্ষণপ্রভা হাসি, আর বোবা কালা চিত্রকর চিত্রে ফুটাইয়া তোলে অনিন্দ্য লীলায় শ্রী ও শ্রীর অপরূপ হিল্লোল। রসের আবেগে ভুলের তরে সান্ত্বনার মুখ একটু ফিরিয়া গেলে বোবা চিত্রকর নীরবে টুল ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া সান্ত্বনার সম্মুখে দাঁড়ায়, দৃষ্টিতে মার্জনার প্রার্থনা করিয়া ধীরে ধীরে তাহার মুখখানি ধরিয়া ঘুরাইয়া দায়; গায়ের কাপড় পায়ের আঁচল একটু-খানি সরিয়া গেলে সে তাহা ভয়ে ভয়ে কুণ্ঠিত করিয়া ঠিক করিয়া দিয়া যায়। বোবার মনের ভাবের কাঁপন তাহার আঙুলের ডগে সান্ত্বনা টের পায়; সান্ত্বনার মুখে যে লজ্জিত কুণ্ঠার অপূর্ব্ব শ্রীটি ফুটিয়া ওঠে, বোবা তাহা প্রাণের রং দিয়া ছবিতে আঁকে।

এমনি করিয়া তিন মাসে ছবি সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল। যে দেখিল সেই বলিল সান্ত্বনার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের সহিত তাহার অন্তরের নারীমূর্ত্তিটিও ছবির রঙে বন্দী হইয়াছে। শ্রীমন্তবাবু মহাখুসী। হাজার টাকার নোট লইয়া চিত্রকরকে বকশিশ দিতে গেলেন। চিত্রকর ঘাড় নাড়িয়া

হাত নাড়িয়া বুঝাইতে চাহিল ছবি এখনো শেষ হয় নাই, কাজ এখনো বাকী আছে। টাকা এখন সে লইবে না।

অবাক করিল বোবাটা! এখনো বাকী কি? অবিকল ছবি ত হইয়াছে।

না, এখনো হয় নাই।

হয় নাই? তিন মাস চুক্তির মেয়াদ ত উত্তরিয়া গেল।

অক্ষম আমি, চুক্তির সময়ের মধ্যে শেষ করিয়া উঠিতে পারি নাই।

শ্রীমন্তবাবুর বিজ্ঞ বন্ধুরা বলিল—বোবাটার বেশী টাকা লইবার ফন্দী।

চিত্রকর লিখিয়া জানাইল—বেশী কিছু সে চাহিবে না।

বিজ্ঞগণ বলিল—লিখিয়া দিয়াছে, দলিল রহিল।

চিত্রকর বাঁ হাতের বুড়া আঙুলে মুণ্ডর ভক্তার ফুটো পরাইয়া সরু মোটা এক গোছা তুলি ধরিয়া টুলের উপর বসিয়া বসিয়া সান্ত্বনার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। ছবিয়লের রসের কথায় চাপা হাসি হাসিতে গেলে সান্ত্বনার

গালে আর চিবুকের মাঝে যে টোলটি পড়ে তাই একটু একটু করিয়া ছবিতে সে ধরে। হাতের মণিবন্ধে আর আঙুলের পাশে জোড়া তিলটি তাহার দৃষ্টি এড়ায় না—রং-ভরা তুলির চুম্বন যত্নে সেটি চুনিয়া রাখে।

বিজ্ঞগণ গম্ভীরভাবে বলিল—বাঘে!

শ্রীমন্তবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমার সান্ত্বনার জন্যে সান্ত্বনা-মাকে চার মাস করেদ খাটালাম! ঠায় এক-জায়গায় আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা।

সান্ত্বনা আড় চোখে সুবিমলের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—আমার কিছু কষ্ট হয়নি বাবা।...ছবিটা কি বাবা ঠিক আমার মতন হয়েছে?

অবিকল! তোর গালের টোলটি, হাতের তিলটি পর্য্যন্ত! হঠাৎ মনে হয় তুইই যা যেন এই বুড়ো বাপকে হাসিমুখে সান্ত্বনা দিচ্ছিস! তুই আর আমায় একেবারে ছেড়ে যেতে পারবিনে।

বৃদ্ধের চোখ ছলছল করিতে লাগিল। সুবিমল অপরাধীর মত মাথা নত করিয়া কার্পেটের নক্সায় আঙুল বুলাইতে লাগিল। সান্ত্বনা কথাটা পাল্টাইবার জন্য

তাড়াতাড়ি বলিল—চিত্রকর কালা বোবা, কিন্তু বেশ ওস্তাদ দেখছি!

কালা বোবা বলেই ও সকল প্রাণ দিয়ে ছবির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। ও নিজে বঞ্চিত কিনা তাই বোধহয় ও আমার মনের ভাবটা ঠিক ধরতে পেরেছিল।

শ্রীমন্তবাবু কাগজে লিখিয়া চিত্রকরকে জানাইলেন—কাল সাধনার বিবাহ, আর দেরী করিলে চলিবে না।

আর দেরী হইবে না; কাল ছবি সম্পূর্ণ হইবে।

বিবাহের পর শ্রীমন্তবাবু ও তাঁহার পত্নী এবং তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধুগণ বর ও বধূকে লইয়া ঘরে ঢুকিয়াই চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন—ছবি!

ছবির পটখানি নাই। ইজেলের উপর শূন্য বাহু মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে শুধু তাহার কঙ্কাল কাঠামোখানা!

চিত্রকর! চিত্রকর! কোথায় সে?

বিবাহের সময় সে ছিল, এখন তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

শ্রীমন্তবাবু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—তবে সে-ই চোর! পুলিশে শিগগির খবর দাও!

সান্ত্বনা অগ্রসর হইয়া বাবার হাত ধরিয়া ধীর মৃদুস্বরে বলিল—সে ত বাবা এক পয়সাও নেয়নি।

বিজ্ঞপণ বলিল—ছবিখানা উত্তরে গিয়েছিল ভালো, বেচে বেশী দাঁও মারবার মতলব। দাও পুলিশ লেলিয়ে।

সান্ত্বনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীর মৃদুস্বরে বলিল—আজ শুভ উৎসবের দিনে কারো অনিষ্ট করো না বাবা!

শ্রীমন্তবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন! শুভ উৎসব সকলের কাছেই বড় ম্লান নিরানন্দ মনে হইতে লাগিল। কি একটা বোবা দুঃখ সান্ত্বনার মনের মধ্যে রক্তের ফোঁটার মতো চুঁয়াইয়া জমা হইতেছিল।

বন্ধু

বীরেন্দ্রের দাদার বিবাহ! বীরেন্দ্র তাহার বরযাত্র। দাদার ভার লইয়া যখন প্রজাপতি ব্যবস্থা করিতেছিলেন তখন তাহার ভারটা পড়িয়াছিল মনোতত্ত্বের উপর।

বিবাহ হইতেছে। বীরেন্দ্র একপাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কন্যাসম্প্রদান দেখিতেছিল, আর দেখিতেছিল একটি তরুণী একখানি ফুলের পাখা লইয়া কি লীলার সহিত বরকনেকে বাতাস করিতেছে।

তরুণীটি পাতলা ছিপছিপে, দেহ-লতা যেন ফুলের পাখার বাতাসে দুলিয়া উঠিতেছে; মুখখানি ঢলঢলে, চোখদুটি টানা-টানা টলটলে, বর্ণটি স্নিগ্ধ সুগৌর, গড়নটি কল্পনার মতো অপরূপ। বীরেন্দ্র অবাক হইয়া ইহাকেই দেখিতেছিল।

তরুণীটিও বুঝিতেছিল কে একটা লোক ঘরের এক কোণ হইতে কেমন অসভ্যের মতো তাহারই দিকে হাঁ-

করিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। সেই অপরিচিতের দৃষ্টির আঘাতে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু তাহার একটু কৌতুকও বোধ হইতেছিল, লোকটা এত লোক থাকিতে তাহাকেই বা অমন করিয়া একদৃষ্টে গিলিতেছে কেন।

তরুণী বাতাস করিতে করিতে তাহার টানা চোখের অপাঙ্গে যতবার বীরেন্দ্রের দিকে চাহিতেছিল, ততবারই তাহাদের চার চোখের মিলন হইতেছিল। আর অমনি দ্বিগুণ সঙ্কোচে সে তাহার চক্ষু ফিরাইয়া লইতেছিল, লজ্জারুণ হাসির রেখা তাহার অধরখানিকে রাঙাইয়া তুলিতেছিল—তাহা যেন স্ফটিকপাত্রে মদিরা—বীরেন্দ্রকে উপহার।

চক্ষু ফিরাইয়া পরমুহূর্তে মনে হইতেছিল লোকটা এখন কি করিতেছে—এখনো কি তেমনি করিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে কি? অমনি অজ্ঞাতসারে তাহার দৃষ্টি ঘরের সেই কোণটার দিকেই অভিসার করিতেছিল যে কোণটায় একটা কে অজানা লোক কেবল তাহারই দিকে তাকাইয়া আছে।

বিবাহ হইয়া গেল। বরকনে বাসর-ঘরে। তরুণী উঠিয়া গিয়াই দূর হইতে বীরেন্দ্রকে দেখাইয়া তাহার এক সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ ভাই, ঐ লোকটি কে জানিস?"

সঙ্গিনী বলিল, "না। কেন?"

তরুণী অকারণে লজ্জিত হইয়া বলিল "না, অমনি।" সেই অজানা লোকটির অসভ্যতার পরিচয় সঙ্গিনীর কাছে কিছুতেই ব্যক্ত করা গেল না।

লোকটা কে জানিবার জন্ত কিন্তু তাহার কৌতূহল তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। তরুণী শত কাজের ছলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বীরেন্দ্রকে চোখে চোখে রাখিতে লাগিল,—পরিচয় জানিবার আগে লোকটা ভিড়ের ভিতর হারাইয়া না যায়।

বরযাত্রদের খাওয়া হইয়া গেলে তরুণী দেখিল সেই লোকটি দিব্য সপ্রতিভভাবে তাহারই নিকটে আসিয়া হাসিয়া দাঁড়াইল। তরুণী লজ্জায় লাল হইয়া পলায়নের উপক্রম করিতেছে, এমন সময় কাহার মিনতিস্বর কানে গেল "আমায় একটু বাসর ঘরে নিয়ে চলুন না।"

তরুণী ভাবিল বাড়ীতে এত লোক থাকিতে আমাকে এ অনুরোধ কেন? সে লজ্জায় আরো লাল হইয়া উঠিল। কষ্টে একটি ছোট্ট "আসুন" বলিয়া বীরেন্দ্রের আগে আগে বাসর-ঘরের পথ দেখাইয়া চলিল।

বীরেন্দ্র বাসর-ঘরের দ্বারে গিয়া ডাকিল "দাদা।"

বর বলিল "কে রে, বীরেন? কি বল্‌ছিস্?"

"আমি বাড়ী যাচ্ছি তাই বল্‌তে এসেছি।"

"কাল সকালে আবার আসিস্।"

"আসব।"

যাইবার কালে বীরেন একবার কাহার সন্ধানে ব্যগ্র দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল। তাহার পথপ্রদর্শিকা তখন কনের পাশে গিয়া বসিয়া হাসিতেছে; বীরেন্দ্রকে পুনরায় পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার কোনো আগ্রহ তাহার দেখা গেল না। অগত্যা অসহায় বীরেন্দ্র একাই কোনোমতে পথ করিয়া বাহিরে গেল।

বীরেন্দ্র দাদার কাছে বিদায় লইয়া আসিল বটে কিন্তু বাড়ী যাইবার জন্ত তাহার কোনোই আগ্রহ প্রকাশ পাইল না। অকস্মাৎ তাহার খুঁজিয়া খুঁজিয়া সকল

পরিচিতের সহিত আলাপ করিবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। কিন্ত সে সর্ব্বান্তঃকরণে আলাপেই রত থাকিতে পারিতেছিল না, তাহার চক্ষু কাহার শেষ দর্শনের আশায় ঘন ঘন চারিদিকে চাহিতেছিল।

একটু পরেই সেই তরুণীটি বীরেন্দ্রের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। সে আজ ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে; একবার ভাঁড়ার-ঘরে, একবার বাসর-ঘরে, একবার উঠানে, একবার দালানে বড় ঘন ঘন গতায়াত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ব্যস্ত হইবারই তো কথা, কাজের বাড়ীতে কাজের লোক কিনা!

রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। নিমন্ত্রিত অভ্যাগতগণ যে যার ঘরে ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। বীরেন্দ্রের আর থাকা চলে না। এদিকে আবার একটি বালক নিদ্রালস কাতর কণ্ঠে বলিতেছিল "বীরেন-কা, তুমি বাড়ী যাবে কখন?"

বীরেন বালককে কথায় বলিল "চল্ এইবার যাই।" কিন্ত চক্ষু আর কাহার কাছে মৌন ভাবায় ব্যাকুল বিদায়-প্রার্থনা করিল। তরুণী ঘাড় হেঁট করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

বীরেন্দ্র শয্যায় শয়ন করিয়া কেবলি মনে করিতে লাগিল "কেমন সুন্দর মেয়েটি! মেয়েটি কে?" বিবাহ-বাড়ীতে কত দিগ্‌দেশের নিমন্ত্রিত এক রাত্রির জন্য মিলিত হইয়া পুনরায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। আর তাহার সহিত কখনো সাক্ষাৎ হইবে কি না কে জানে? না হওয়াই সম্ভব। কিন্তু তবু বীরেন্দ্রের বিনিদ্র রজনী সেই অজানার ধ্যানেই প্রভাত হইয়া গেল। সমস্ত রাত্রি তাহার মনের মধ্যে বার বার গুঞ্জন করিয়া উঠিতেছিল—

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কোথা কে ধরা পড়ে কে জানে।
গরব সব হায় কখন্ টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে।"

প্রভাতে উঠিয়াই তাড়াতাড়ি বীরেন্দ্র দাদার শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিল। বাড়ীর চৌকাঠ পার হইতেই তাহার অন্তর আন্দোলিত হইয়া উঠিল। যদি তাহার দেখা পাই? যদি না পাই?

বীরেন্দ্র বৈঠকখানায় গিয়া বসিল, তাহার চিত্তটি কিন্তু -

বারবার অন্তঃপুরের দিকে উঁকি মারিতেছিল। সেই তরুণীটি এবাড়ীতে নাই, তাহার সহিত আর দেখা হইবে না, ইহা জানিলেও যেন সে নিশ্চিন্ত হইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে।

বেলা হইল। বরকনেকে বিদায় দিবার আয়োজনে সকলে ব্যস্ত। বিদায়ের ক্ষণ যত ঘনিষ্ঠ হইয়েছে বীরেন্দ্রের চিত্তও তত চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

বীরেন্দ্রকে কিছু মিষ্টমুখ করিয়া যাইতে হইবে—একবার পা তুলিয়া বাড়ীর ভিতর যাইতে হয়। বীরেন্দ্রের বুক আনন্দ-উদ্বেগ-আশঙ্কায় ধড়াস করিয়া উঠিল।

"না না, তাও কি হয়, এত সকালে" ইত্যাদি মামুলি অকিঞ্চিৎকর ওজর অগ্রাহ্য হওয়ায় বীরেন্দ্র যেন অগত্যা অন্দরে চলিল। তাহার অন্তর কিন্তু তখন তোলপাড় করিতেছিল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই বীরেন্দ্রের দাদার শাশুড়ী বলিলেন, "এস বাবা এস। তুমি ঘরের ছেলে, অমন পরের মতন বাইরে বসে' ছিলে কেন। এস, এই ঘরে এস।"

সেই ঘরে বরকনে বসিয়া ছিল। আর ছিল বসিয়া আর একজন—যাহার দর্শনলালসায় বীরেন্দ্রের চিত্ত উৎসুক পর্য্যাকুল—সেই তরুণী।

বীরেন্দ্র ঘরে ঢুকিতেই সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। চার চোখে এক হইতেই বীরেন্দ্রের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তরুণীও স্মিতমুখ নত করিল।

বীরেন কার্পেটের এক প্রান্তে বসিল। তরুণীও উঠিয়া দাঁড়াইল। গিন্নি তাহাকে উঠিতে দেখিয়া বলিলেন "মা স্বহু, বীরেনকে একটু জলখাবার এনে দে না মা।"

স্বহু আর-একবার বীরেনের দিকে চকিত চাহনি হানিয়া চলিয়া গেল। বীরেন ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল, তবু সে-দৃষ্টি তাহার অদেখা রহিল না।

অল্পক্ষণ পরে এক রেকাব মিঠাই ও এক গেলাস জল লইয়া স্বহু অবনত হইয়া বীরেনের কোলের কাছে রাখিল।

এত নিকটে! বুঝি বা উভয়ে উভয়ের হৃৎস্পন্দন শুনিতে পাইয়াছিল। উভয়ে কেন লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। স্বহ সোজা হইয়া দাঁড়াইবামাত্র বীরেন চোখ তুলিয়া

৪

চাহিল। আবার চার চোখের মিলন! তরুণীর তরল চাহনি চঞ্চল ও বীরেনের মুখ হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তরুণী সাবলীল চঞ্চলতার সহিত বীরেনের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

বীরেন খাইতেছিল আর তাহার অন্তরে ধ্বনিত হইতেছিল—স্থহ্! স্থহ্!—স্থহ্ কোন্ নামের অপভ্রংশ? স্থকুমারী—স্থখময়ী—না কি? নিশ্চয় এ ইহাদের আত্মীয়। বৌদিদির কাছে পরিচয়টা জানিয়া লইতে পারিবে বলিয়া বীরেন কতকটা আশ্বস্ত হইল।

বরকনে বিদায় লইল। রোরুদ্যমানা বধূকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে গেল স্মিতাননা স্থহ্। বীরেনের সঙ্গে আবার তাহার চক্ষুর মিলন হইল। মনোভবের কারসাজি।

বাড়ীতে ফিরিয়াই বীরেন বৌদিদির সঙ্গে আলাপ করিবার জন্ত অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া উঠিল। বিমনা বধূকে ঘিরিয়া যত রাজ্যের মেয়েরা বকিতেছে হাঁসিতেছে, বীরেন আর আলাপ করিবার অবকাশ পায় না।

বীরেন বারবার কাজের ছুতা করিয়া বৌদিদির কাছে

যায়, ছল খুঁজিয়া কথা বলে, বৌদিদির কি দরকার বারবার জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া জোগায়। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় বৌদিদিকে একটু নিরিবিলি পাইয়া বীরেন তাহার কাছে গিয়া বসিয়া বলিল "বৌদি, চিরকালের চেনা ঘর ছেড়ে অপরিচিতের রাজ্যে এসে ভারি মন কেমন করছে, না? কিছুদিন পরে কিন্তু এই অচেনা ঘর ছেড়ে চেনা ঘরে গিয়ে তিষ্ঠতে পারবে না।"

বৌদিদির মুখখানি দুঃখমলিন থাকা সত্বেও বীরেন্দ্রের কথায় লজ্জারুণ হইয়া ভারি সুন্দর দেখাইল। একটু হাসিয়া বীরেন্দ্রের দিকে একটু সকৌতুক কটাক্ষ হানিয়া বলিল "ইস! তা বৈ কি!"

বীরেন হাসিতে হাসিতে বলিল "দেখে নিয়ো তখন—আমি কেমন গণৎকার, আর আমার দাদাটি কেমন যাদুকর।"

"যাও।" বলিয়া হাসিয়া বৌদি ঘাড় হেঁট করিল।

এইরূপে অল্পে অল্পে লজ্জার আবরণ অপসারণ করিয়া উভয়ের আলাপ জমিয়া উঠিল।

তখন বীরেন প্রশ্ন করিল, "বৌদি, তোমরা ক বোন?"

"আমার আর বোন নেই।"

বীরেন সমস্ত হৃদয়ের বল সংগ্রহ করিয়া বলিল "তবে সেই যাকে তোমার মা স্থকু বল্লেন সে কে?" এই সহজ কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে বীরেনের গলা কেন কাঁপিয়া গেল, বুকটা ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল।

বৌদিদি বলিল "সে আমার পিস্‌তুতো বোন। তার মা বাপ নেই, সে আমাদের বাড়ীতেই থাকে।"

"তার পুরো নামটি কি বৌদিদি? স্থকুমারী?"

"হ্যাঁ।"

"ওর বিয়ে হয়েছে?"

বৌদিদি হাসিয়া বলিল "না। কিন্তু তোমার কোনো আশা নেই, সে যে তোমার স্বগোত্তর।" বৌদিদির মুখের উপর দিয়া একটা দুষ্ট কৌতুকের হাসি বিজলি হানিয়া গেল।

বৌদিদির স্বাভাবিক রসিকতাটুকু বীরেন্দ্র বেশ সহজে গ্রহণ করিতে পারিল না। সে কেমনতর গম্ভীর হইয়া গেল। হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া বলিল "বৌদি, তুমি বস,

আমি তোমায় কতকগুলো বই এনে দি, যখন একলা থাকবে পড়বে।”

বীরেন্দ্র আপনার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার অন্তরের মধ্যে তাহার বৌদিদির কথার অনুরণন হইতেছিল—“তোমার কোনো আশা নেই।”

আশা যখন নাই তখন বীরেন্দ্র আপনাকে সংবরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই চেষ্টাই কাল হইল। জাগ্রত প্রহরায় তাহার অন্তর হইতে সুকুমারীর স্মৃতি অপসৃত হইবার অবসরই পাইল না।

অষ্টাহ পরে বধূ পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেল, সঙ্গে গেল বীরেন্দ্র। আবার সুকুমারীর সঙ্গে তাহার চোখোচোখি হইল। সুকুমারী হাসিল। বীরেন্দ্র হাসিতে পারিল না, তাহার প্রাণের উপর জগদ্দল পাথর চাপিয়া বসিতেছিল।

বীরেন্দ্রের আগমনে সুকুমারী ঘর হইতে চলিয়া যাইতেছিল, তাহার দিদি তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল “আরে পালাস্ কোথায়? ঠাকুরপোকে দেখে আবার লজ্জা! তুই ঠাকুরপোর সঙ্গে ততক্ষণ কথা বল, আমি বাবার সঙ্গে দেখা করে আসি।”

একদা একঘরে বীরেন্দ্র আর স্বকুমারী। বিধাতার পরিহাস! কিন্ত তাহারা কি যে বলিবে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। স্বকুমারী লজ্জানত মুখে নখ খুঁটিতে লাগিল, বীরেন আঙুলে রুমাল জড়াইয়া জড়াইয়া খুলিয়া আবার জড়াইতে লাগিল। তাহাদের অনেক কথা বলিবার ছিল বলিয়া একটা কথাও বলা হইল না।

একঘরে দুটি মানুষ—অথচ কোনো বাক্যালাপ নাই। এরকম অবস্থায় থাকা অস্বস্তিকর ও লজ্জাজনক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তখন যা-হোক-একটা-কাজে নিজেদের ব্যাপৃত করবার জন্য স্বকুমারী একথালা জলখাবার আনিয়া বীরেনের কোলের কাছে রাখিল। বীরেন কিছু না বলিয়া শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, খাবারে হাত দিল না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর স্বকুমারী যখন দেখিল বীরেন খায় না, তখন সে মৃদু স্বরে একটি ছোট কথা বলিয়া ফেলিল—"খান।"

বীরেন হাসিয়া বলিল "ও! আমায় খেতে দিয়েছেন বুঝি?"

এই কথায় স্বকুমারী ভারী কৌতুক অনুভব করিয়া বলিল "আপনি কি মনে করেছিলেন?"

বীরেন বলিল "আপনি ত কিছু বলেন না, আমি মনে করলাম ওগুলো আপনি নিজে খাবেন বলে' নিয়ে এলেন বুঝি!"

সুকুমারী পরাজিত হইয়া বলিল "যান! কি যে বলেন!"

যাহাদের খশুরের পরিচয় হইয়া গেছে, তাহাদের লৌকিক সঙ্কোচের বাঁধ একবার ভাঙিলে হয়, তখন তাদের প্রবাহ রোধ করা দায় হইয়া উঠে। তাহাতে আবার ইহাদের ঠাট্টার সম্পর্ক। শীঘ্রই আলাপ জমিয়া উঠিল।

নববধূ এখন খুব ঘন ঘন বাপের বাড়ী হইতে শ্বশুর-বাড়ী ও শ্বশুরবাড়ী হইতে বাপের বাড়ী গতায়াত করিয়া নূতন বাড়ীর সহিত পরিচয় ও পরগৃহবাস অভ্যাস করিতেছে। এক বাড়ী হইতে আর এক বাড়ীতে রাখিতে যাওয়া ও লইয়া আসা বীরেনের ভার। বীরেন পরম উৎসাহের সহিত আপন কর্ত্তব্য পালন করে।

এইরূপ গতায়াতে অল্পে অল্পে নিজেদের অজ্ঞাতসারে বীরেন্দ্র সুকুমারী খুব ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। বড় একজন মেয়েকে তার নাম ধরিয়া ডাকিতে সঙ্কোচ হয়। তাই

বীরেন্দ্র একদিন বলিল "আপনার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক পাতাতে হচ্ছে, নইলে আপনাকে কি বলে' ডাকি ?"

বৌদিদি বলিল "ঠাকুরপো, তুমি আমায় বল 'তুমি' আর আমার বোনকে বল 'আপনি'। বেশ ত !"

বীরেন হাসিয়া বলিল "তুমি আমার বৌদি, তোমায় 'তুমি বলা সাজে। ওঁকে তুমি বলি কোন্ সম্পর্কে ?"

"ওকে 'তুমি' বোলো বন্ধু সম্পর্কে। ও তোমার বন্ধু। কেমন ?"

বীরেন উৎসাহিত হইয়া বলিল "হ্যা ঠিক ঠিক। উনি আমার বন্ধু।"

বীরেন্দ্রের উৎসাহ স্বকুমারীকে লজ্জিত করিয়া তুলিল।

অল্পে অল্পে এই বন্ধুত্বও সহজ হইয়া আসিল। তাহাদের আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতর হইয়া ক্রমে ক্রমে আসক্তি এমন প্রবল হইয়া উঠিল, যে, বীরেন্দ্রকে একদিন না দেখিতে পাইলে স্বকুমারী বিমর্ষ হইয়া পড়ে, স্বকুমারীকে একদিন না দেখিলে বীরেন্দ্র চঞ্চল হইয়া উঠে। রোজ রোজ কুটুম্ববাড়ী যাওয়াও যায় না, ছলছুতা খুঁজিয়া কিংবা খুব দেরি করিয়া যাইতে হয়। কিন্তু প্রাণ ছটফট করিয়া সারা হয়। বীরেন্দ্র

যেদিন দেখা করতে যায়, স্বকুমারী জিজ্ঞাসা করে "আবার কবে আসবে ?" বীরেন্দ্রের অন্তর বলিতে চাহে "কাল।" কিন্তু জোর করিয়া মুখে বলে "সেই শুক্রবার।" স্বকুমারী আনমনে বলে "শু-ক্‌-র-বা-র।" তারপর সেই শুক্রবারের প্রতীক্ষায় উভয়ের যে যাতনা সহ্য করিতে হয় তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিতে পারিবে না।

কিছুদিন পরে স্বকুমারীর জর হইল। বীরেন্দ্রের ইচ্ছা করিত সে রাতদিন তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া ঔষধপথ্য জোগাইয়া তাহাকে আনন্দিত রাখে। কিন্তু কেমন বাধো-বাধো বোধ হইত বলিয়া পারিত না। দুতিন দিন পরে বৌদিদি বলিল "ঠাকুরপো, স্বকুকে একটা কিছু ওষুধ দাও। তুমি বাড়ীর ডাক্তার থাকতে বাইরের ডাক্তার ডাকি কেন ?"

বীরেন্দ্র প্রাণপণ উৎসাহে স্বকুমারীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিল। রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিতে বসিয়া রোগীর হাতখানি ডাক্তারের মুঠির মধ্যে বড় বেশি বিলম্ব করিত; ডাক্তারের আঙুল কটি যখন রোগীর শিরাধমনীর উপর সঞ্চালিত হইত, তখন রোগীর অন্তর-বীণায় তারগুলি

যেন বাজিয়া উঠিত; ডাক্তার টিৎকার কোলোরোফম ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে রোগী ও ডাক্তার উভয়ের প্রাণের উপর কোলোরোফর্মের আবেশ বিস্তৃত হইয়া পড়িত। ডাক্তার প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লিখিতে গিয়া আনমনে লিখিয়া ফেলিত—

"আনন্দময়ী মুরতি তোমার,
কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা!
অমৃতসরল তোমার পরশ,
তোমার নয়নে দিব্য বিভা!"

এই ব্যবস্থা রোগীর কাছেও পরম রসায়ন বলিয়াই বোধ হইত।

এমন সব সুচিকিৎসার গুণে রোগী শীঘ্র সারিয়া উঠিল। ডাক্তারের ঘনঘন আসার আর আবশ্যক রহিল না।

অনেকদিন পরে একদিন বীরেন্দ্র বৌদিদিকে বাপের বাড়ী রাখিতে গিয়াছে। বীরেন সুকুমারী একলা বসিয়া গল্প করিতেছে। হঠাৎ বীরেন্দ্র বলিল "দেখ বন্ধু, শীগ্‌গির তোমার বিয়ে হবে—কিন্তু আমার সঙ্গে নয়—এটা ঠিক। যার সঙ্গেই হোক, আমি চিরদিন তোমার বন্ধু থাকব।

তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে ত।"

সুকুমারী হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

বীরেন্দ্র ও সুকুমারীর মিলন দুর্ঘট বলিয়াই প্রণয় ক্রমে ক্রমে খুব প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। বীরেন্দ্রের বৌদিদি আজকাল প্রণয়-ব্যাপারে নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছিল; সে সব বুঝিতে পারিল। একদিন সুকুমারীকে বলিল "হ্যাঁলো, এমনি করেই কি আত্মহত্যা কর্‌তে হয়?"

সুকুমারী কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার দিদি তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। তাহারও অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল।

সুকুমারীর বিবাহের সম্বন্ধ চলিতেছিল। তাহার দিদি একদিন বাবাকে বলিল "বাবা, বীরেন-ঠাকুরপোর সঙ্গে সুকুর বিয়ে দিলে হয় না?"

"স্বগোত্রে কি বিয়ে হয় রে পাগলি?"

"কেন? ঐ যে পরিতোষদার হয়েছে!"

"তারা যে ব্রাহ্ম।"

"আমাদের কি কোনো মন্ত্রে হতে পারে না।"

"না। তা কি হয়?"

"হলে কিন্তু বেশ হত।"

"তা ত বুঝি, দুটি বোনে তোরা এক জায়গায় থাকৃতিস। কিন্তু তা যে হবার জো নেই।"

বৌদিদি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রস্থান করিল। মনোভব যখন মিলনের ভার লয়, আমাদের দেশের প্রজাপতি তখন এত করিয়া বাদ সাধে কেন?

সুকুমারীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল।

তার পর একদিন বীরেন বেড়াইতে আসিয়াছে। সুকুমারী হাসিতে হাসিতে বলিল "বন্ধু, তোমার জন্তে একটা আনন্দ-সংবাদ আছে।"

বীরেন অতিমাত্র আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল "কি বন্ধু, কি?"

সুকুমারী বলিল "আমার বিয়ে!"

তাহার দিদি ভ্রূকুটি হানিয়া বলিল "মর পোড়ারমুখী! সব তাতেই রঙ!"

সুকুমারীর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। মুখে জোর করিয়া হাসিয়া বলিল "বা রে! আমার বিয়ে, আমার

বন্ধুকে এমন আনন্দ-সংবাদ দেবো না ?"

বীরেন্দ্রও গূঢ় অন্তর্বেদনাটাকে লঘু করিয়া ফেলিবার ব্যর্থ প্রয়াসে জোর করিয়া হাসিয়া উৎসাহ দেখাইয়া বলিল "কবে বন্ধু, কবে ?" কথা বলিতে কিন্তু গলা কাঁপিয়া গেল।

সুকুমারী কটাক্ষ হানিয়া হাসিয়া বলিল "নেমন্তন্ন হবেই, টেরও পাবে।"

বৌদিদি সুকুমারীর দিকে ভৎর্সনার দৃষ্টি হানিল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাহার দুই চক্ষুর ভৎর্সনা চোখের জলে গলিয়া পড়িল।

সহানুভূতির স্পর্শে সুকুমারীরও রুদ্ধ বেদনার বাঁধ ভাঙিয়া গেল। সে দিদির কোলে মুখ লুকাইল। বীরেন্দ্র আস্তে আস্তে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

যাহার সহিত সুকুমারীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে তাহার নাম সন্তোষ। সে এইবার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছে। সে বীরেন্দ্রেরই সহপাঠী।

বহুকাল হইতে বীরেন্দ্রের সহিত সন্তোষের দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। বীরেন্দ্র হঠাৎ তাহার সহিত পত্রপ্রসঙ্গে বন্ধুত্ব বাঁধাইয়া লইল।

সন্তোষ বিবাহ করিতে কলিকাতায় আসিল। বীরেন্দ্র তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। সন্তোষ বলিল "ওহে বীরেন, শুনেছ, আমার বিয়ে।"

বীরেন হাসিয়া বলিল "কবে হে, কোথায় ?"

"এই ভবানীপুরের রমেশ উকিলের বাড়ী। আর শনিবার বিয়ে। তোমায় বরযাত্র যেতে হবে কিন্তু, এখন থেকে বলে' রাখ্‌ছি।

"নিশ্চয় যাব। কনে দেখেছ ?"

"তা আর দেখিনি ?"

"কেমন ?"

"A veritable Rosalind is she !

'By heavenly synod was devis'd.

Heaven would she many gifts should have.

And I to live and die her slave !"

বীরেন হাসিয়া বলিল "সত্যি নাকি কবি। শুধু বর্ণনেই এই ! আলাপ হলে যে একেবারে Orlandoর মতো লণ্ডভণ্ড অবস্থা হবে সেটা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি।"

সন্তোষও হাসিয়া বীরেনের কাঁধ ধরিয়া একটা নাড়া

দিয়া বলিল "প্রেমতত্ত্ব তুমি কি বুঝ্বে ভায়া! শুধু যত রাজ্যের মরা heart dissection করে' মরেছ, জ্যান্ত heart নিয়ে ত নাড়াচাড়া করনি। যখন কর্‌বে বুঝ্‌বে হে বুঝ্‌বে।"

"থাক্ ভাই তোমার বোঝা তোমার ঘাড়ে। আমার বোঝার দরকার নেই। তোমার যেমন কাহিল অবস্থা দেখ্ছি,—তোমার বন্ধু আমি, তোমার প্রেয়সীকে কি উপহার দেবো বল ত—a heart pierced through and through by an arrow—কেমন?"

বীরেনের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া সন্তোষ বলিল 'Bravo! a capital poetic idea!

বীরেন বাড়ী ফিরিয়া বলিল "বৌদি আর শনিবার হুকুর বিয়ে!"

বৌদিদি কাতর দৃষ্টিতে বীরেনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "কে বল্লে?"

"স্বয়ং বর নিজে।"

"সে কি! তার সঙ্গে আবার তোমার কোথায় আলাপ হ'ল?"

"সে আমার সহপাঠী বৌদি।"

"সে কি জানে তুমি হুকুমারীর—পরিচিত?"

"না বৌদি, এখনো সে তত্ত্ব ফাঁস করিনি। বিয়ের পর তাকে surprise করতে হবে। জানো বৌদি—বিয়ের সময় হুকুকে কি উপহার দেবো ঠিক করেছি?"

"না। কি?"

"একটা ব্রচ—একটা—বাণবিদ্ধ হৃদয়। কেমন বৌদি ঠিক হবে না।"

"নাঃ! তোমাদের সকল তাতেই রঙ! নিজের দুঃখটাকেও রেহাই দাও না।"

"রেহাই দি না বলেই ত টি'কে আছি বৌদি। নইলে, যদি মলিনমুখে দিবানিশি শুধু দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুজল নিয়ে থাকতাম তা হলে লোকে আমাদের পাগল ভাবত কি না বল ত? দুঃখের ওপর অপমান—সেটা কি না শোচনীয় অবস্থা নয় বৌদি?"

"বিয়ের দিন যাবে?"

"যাব না বৌদি, তুমি কী বল? সন্তোষ নেমন্তন্ন করেছে, হুহু করবে, তুমিও করবে—"

"না, আমি করব না। বারণ করব। সুকুকেও বারণ করতে বলব।"

"না, না, বৌদি, সে কি হয়? আমায় যেতেই হবে। আমি যে বরযাত্র।"

"চোখের সামনে দেখতে পারবে?"

"হ্যাঁ, বৌদি, বেশ পারব। যে আত্মহত্যা করতে উন্মত্ত তার খুনেকে কিসের ভয় বৌদি?"

বৌদিদি আর কোনো কথা বলিতে পারিল না।

বিয়ের সব ঠিকঠাক। বীরেন বৌদিদিকে বিয়ে-বাড়ীতে রাখিতে গেল। সুকুমারী আসিয়া হাসিয়া বলিল "বন্ধু—এই শনিবার!"

বীরেন হাসিয়া বলিল "জানি হে বন্ধু, জানি।"

"কোথায় এর মধ্যে খবর পেলে।"

"কেন, তোমার বিয়ের খবরটা যেন তোমারই একান্ত নিজস্ব, আর কারো যেন সে খবর রাখতে নেই!"

"না, সত্যি বল না, কোথায় টের পেলে?"

"কেন, সন্তোষের কাছে।"

"ওমা, এর মধ্যে সেদিকটাও আগ্‌লাতে আরম্ভ করেছ বুঝি! সেখানে জুটলে কেমন করে'?"

"তুমি একেবারে অজানার কাছে গিয়ে জুটতে পার, আর আমি বুঝি আমার সহপাঠীর কাছে জুটতে পারিনে।"

"ও!—সন্তোষ-বাবু বুঝি তোমার সহপাঠী!"

"সন্তোষ-বাবু কি রে বেহায়া মেয়ে! থামিন্, প্রভু, হৃদয়েশ্বর!"

"প্রথম ঝুটো, শেষটা নয়।" বলিয়া সুকুমারী ছুটিয়া চলিয়া গেল।

শনিবার। আজ সুকুমারীর বিবাহ। বীরেন্দ্র আবার বরযাত্র আসিয়াছে। দাদার বিবাহে বরযাত্র আসিয়া বীরেন সুকুমারীর হৃদয় জয় করিয়াছিল; আজ সুকুমারীর বিবাহে বরযাত্র আসিয়া সে নিজের পরাজয় দেখিতেছে। সেই ঘরের সেই জায়গাটিতে—যেখানে এক বৎসর পূর্ব্বে সুকুমারী ফুলের পাখা লইয়া দিদির বিবাহঁ দেখিয়াছিল ঠিক সেইখানে—আজ এক বৎসর পরে সুকুমারী ফুলের গহনা পরিয়া বধূবেশে বসিয়া আছে। আর আজও সেই

কোণটিতে দাঁড়াইয়া আছে বীরেন যে কোণ হইতে সে সুকুমারীর সহিত শুভদৃষ্টি করিয়াছিল। আজ সে সুপরিচিত হইয়াও দূরে চলিয়া যাইতেছে, অপর একজন অজানা আজ সুকুমারীর নিকট জীবন-মরণের পরিচয় স্থাপন করিতে আসিয়াছে। সুকুমারী আজও তেমনি ব্রীড়াবনত মুখ যখনই তুলিতেছিল তখনই অপাঙ্গে দেখিতেছিল বীরেন বুকের উপর হাত দুখানা শৃঙ্খলিত করিয়া অনিস্পন্দ দাঁড়াইয়া, গভীর ভাবে তাহারই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। প্রজাপতির পরিহাস!

বিবাহ হইয়া গেল। বরকনে বাসর-ঘরে। আজ আর বীরেনকে বাসর-ঘরে পথ দেখাইয়া লইবার জন্ত কোনো উৎসুক হৃদয় ছল খুঁজিয়া বেড়াইতেছে না। এত লোকের মধ্যেও বীরেন আজ একা। সে সকলের অজ্ঞাতে বাড়ী ফিরিয়া গেল। অসংখ্য জনতার মধ্যে কেবলমাত্র একজন ব্যথিত চিত্তে বীরেন্দ্রের খোঁজ করিতেছিল—সে তাহার বৌদিদি।

বিবাহের পর বীরেন্দ্র আর সন্তোষের বাড়ী যায় নাই। সন্তোষ বীরেন্দ্রের বাড়ী গিয়া বলিল "কি হে, এ কদিন

যে তোমার টিকি দেখবার জো নেই। আজ তোমার নেমন্তন্ন। আজ বৌভাত। একটু সকাল-সকাল যেয়ো কিন্তু।"

বীরেন্দ্র সুকুমারীর বৌভাতের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেল। প্রজাপতির পরিহাস!

সন্তোষ সুকুমারীর সহিত একঘরে বসিয়া গল্প করিতেছিল। বীরেন্দ্রের আগমন সংবাদ পাইয়া সন্তোষ বলিল "বীরেনকে এখানেই ডেকে আন।"

সুকুমারী উঠিয়া যাইতেছিল। সন্তোষ তাহার হাত ধরিয়া বলিল "পালাও কোথায়? বীরেন বাঘভালুকের নাম নয়। আমারই একটি বন্ধু। তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো—ভারি আমুদে মজার লোক।"

সুকুমারীর মুখ লাল ও হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সন্তোষ মনে করিল বধূসুলভ লজ্জা।

বীরেন ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল সন্তোষ একখানি সোফার উপর বসিয়া, পাশে সুকুমারী দণ্ডায়মানা, তাঁহার বামহাতখানি সন্তোষের হাতের মুঠির ভিতর। বীরেন দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

সন্তোষ হাসিয়া বলিল "তোমার নামটাই শুধু বীরেন্দ্র! সাহস দেখছি এক তিল নেই। এস হে এস।"

বীরেন্দ্র একবার চকিতে স্কুমারীর দিকে চাহিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানা চেয়ারে বসিল।

সন্তোষ বলিল "এস বীরেন তোমাদের পরিচয় করিয়ে দি।—ইনি—"

বীরেন বাধা দিয়া বলিল "থাক, স্কুমারীর সঙ্গে আমার পরিচয় তোমাকে করিয়ে দিতে হবে না! স্কুমারী তোমায় যা চেনে তার চেয়ে আমায় ঢের বেশি চেনে।"

সন্তোষ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল "তাই নাকি?" তারপর স্কুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল তাহা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছে। বীরেনকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার সঙ্গে কেমন করে' পরিচয় হল?"

বীরেন বলিল "স্কুরু দিদি আমার বৌদি। আর শুধু কি তাই?—স্কুরু আমার বন্ধু, আমি একে যত ভালোবাসি তুমি জীবনে কখনো তত ভালোবাসতে পারবে কি না সন্দেহ। সত্যি কি না স্কুরুকেই জিজ্ঞেস কর।"

সন্তোষ অবাক্ হইয়া একবার বীরেনের দিকে, আর

একবার সুকুমারীর দিকে চাহিল। বীরেন দিব্য সপ্রতিভ-ভাবে বসিয়া হাসিতেছে; সুকুমারী লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছে; সন্তোষ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল—বিবাহ করিয়া এমন বিপদে আর কেহ পড়িয়াছে কি? বেচারা একটি বৌ ঘরে আনিল, কিন্তু তাহার হৃদয়খানি আর-একজনের কাছে বাঁধা! সন্তোষ বীরেনকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা যদি এতই ভালো বাস, তবে তুমি বিয়ে কর্‌লে না কেন?"

"হবার জো নেই তাই, প্রজাপতির অভিসম্পাত—সুকু আমার স্বগোত্তর।"

এর পরে সন্তোষ যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। বীরেনই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল "এই কথাটা আমি তোমায় বলে' ফেলা দরকার মনে করেছিলাম। একপ্রাণ প্রেম হৃদয়ে গোপন রেখে চোরের মতো তোমার অন্তঃপুরে গতায়াত করা আমার উচিত হ'ত না। সব বলে' আমি খালাস। এখন যদি তুমি বারণ কর আমি আর সুকুমারীর ছায়া মাড়াব না।" বীরেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় সন্তোষের মুখের দিকে চাহিল।

সন্তোষ বীরেনের হাত ধরিয়া বলিল "যাও কোথায়,

বোলো। তুমি যে অকপট আত্মপরিচয় দিলে এর পরে আমি তোমাকে কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারি নে। যদি তুমি আমাকে না-ই বলতে? তুমি অসঙ্কোচে আসবে, আমি থাকলেও, না থাকলেও—স্বকু, যে তোমার বন্ধু!" তারপর স্বকুমারীর দিকে ফিরিয়া সন্তোষ বলিল "স্বকু, তোমার বন্ধু তোমার জিম্মা, তুমি একে খাওয়াও। আমি একবার বাইরে দেখে আসি কে কে এল।"

বীরেন্দ্রের অকপট শুচিতায় ও সন্তোষের উদার বিশ্বাসে স্বকুমারীর অন্তর ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আজ স্বামীর প্রতি পরিপূর্ণ অনুরাগে তাহার বিবাহ সার্থক হইয়া উঠিল। সে স্বামীকে মনে মনে প্রণাম করিয়া বীরেন্দ্রের আহারের আয়োজন করিতে লাগিল। এক বৎসর আগে বীরেন্দ্রকে খাওয়াইতে তাহার প্রাণ যেমন হর্ষ সরসে ভরিয়া উঠিয়াছিল, আজও তেমনি—আজ যেন আবার বীরেন্দ্রের সহিত তাহার নূতন করিয়া পরিচয় হইল।

চায়া-ওয়া

আমি যখন জাপানে যা-হোক-একটা-কিছু শিখিবার জন্ত যাত্রা করিয়াছিলাম তখন আমার হিতৈষী অভিভাবকগণ অনেক কিছু আশা করিয়াছিলেন ; আমিও নিজে নিজের সাফল্যের সম্বন্ধে যে বিশেষ আশাবান ছিলাম তাহা বলাই বাহুল্য।

একদিন প্রত্যুষে ইডেন গার্ডেনের ঘাট হইতে যখন জাহাজে চড়িলাম তখন সেই প্রভাতেরই কনক-রৌদ্রের মতো আমার ভবিষ্যৎ বড় সুন্দর বড় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। আগাগোড়া শুধু সফলতা, শুধু জয়। তাই যখন বন্ধুজনের বিরহবেদনা পাথেয় লইয়া জাহাজ কোন্ সেই অচেনা অজানা সুদূরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করিল, তখনো আমার মুখ নিষ্প্রভ হইয়া গেল না।

কত অপূর্ব্ব দেশ, বিচিত্র মানব, চমৎকার দৃশ্য দেখিতে

দেখিতে সাগরবক্ষে নাচিতে নাচিতে আমার আশার নন্দন জাপানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

একদিন যখন দূর হইতে জাপানী নাবিকেরা স্বদেশের অরুণচক্রনিভ তটরেখা দেখিয়া সমস্বরে "বান্জাই" বলিয়া হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল, তখন আমার চিত্ত প্রথম-প্রণয়-সম্ভাষণ-ভীরু নবোঢ়া বধূর মতো চঞ্চল হইয়া উঠিল।

আমাদের জাহাজ জাপানের য়োকোহামা বন্দরে গিয়া লাগিল। আমি সেখানেই নামিলাম। এই শহরে দুদিন বিশ্রাম করিয়া তারপর ট্রেনে তোকিয়ো যাইব।

একটি হোটেলে আশ্রয় ঠিক করিয়াই শহর দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

সমস্ত দেশটা যেন স্বপ্নের মতো, মায়ার মতো, কল্পনার মতো; বাড়ীগুলি যেন ছবি, মানুষগুলি যেন পুতুল, কারখানা যেন কলের। রাস্তায় আবর্জ্জনা নাই, গোলমাল নাই, গাড়ীঘোড়ার হুড়াহুড়ি নাই। পথিকেরা শান্ত, মানুষটানা রিক্শা গাড়ীগুলিও নিঃশব্দ; সমস্ত সহরটি যেন তন্দ্রাবেশে আচ্ছন্ন, এমনি একটা মোহময় স্তব্ধতা সর্ব্বত্র বিরাজিত।

যাহা দেখি তাহাই আমার চক্ষে নূতন ঠেকে। আমার

কাজ ছিল না, চাখিয়া চাখিয়া সমস্ত খুঁটিনাটি দেখিয়া লইতেছিলাম।

দোকানগুলি ফিটফাট, শিল্পকলার লীলানিকেতন। এক একটা দোকানের কাছে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছিল। যে দোকানগুলি দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ সেগুলিও সুন্দর, আবার যেগুলি রিক্ত সেগুলিও চমৎকার,—তাহাদের শূন্যতা মনকে শান্তি দেয়, কিন্তু চক্ষুকে পীড়া দেয় না।

এমনি একখানি আসবাবহীন দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া তাহার রিক্ত সৌন্দর্য দেখিতেছি, এমন সময় আমায় চমকিত করিয়া কাহার মধুসম্ভাষণ আমাকে অভিনন্দন করিল—দায়া মুকায়্ক! (আসিতে আজ্ঞা হোক মহাশয়!)

আমি চেতনা পাইয়া দেখিলাম আমি একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া আছি। একটি তরুণী তাহার হাত দুখানি দুই উরুর উপর রাখিয়া একটু নত হইয়া আমাকে তাহার দোকানে অভ্যর্থনা করিতেছে—দায়া মুকায়্ক!

সে ঘরে কী ভব্যতা, কি বিনয়! অভ্যর্থনার সে কী সরল ভঙ্গী! আমার কোনো পুরুষে চায়ের ধার ধারে না, তবু এমন তরুণীর এমন আহ্বান আমি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। চায়াতে (চায়ের দোকানে) প্রবেশ করিলাম।

তরুণী চায়া-ওয়া (চা-ওয়ালী) অমনি আমার সম্মুখে আসিয়া দুই উরুতে হাত রাখিয়া ঈষৎ অবনত হইয়া দাঁড়াইল; তারপর সরলভাবে দাঁড়াইয়া একখানি চেয়ার টানিয়া দিয়া বলিল—ও কাকে নাসাই! (বসিতে আজ্ঞা হোক!)

আমি চেয়ারে বসিলাম। তরুণী চায়া-ওয়া পুতুল-বাজির পুতুলের মতো নিঃশব্দে চলিয়া-গেল এবং মুহূর্তেক পরে এক পেয়ালা চা আনিয়া আমার সামনে একটা সেপায়ার উপর রাখিল; আর আনিল একটা রেকাবে করিয়া খানকতক সাকুরা-মোচি (চেরিফুলের পিঠে)।

চীনে মাটির শুভ্র স্বচ্ছ পেয়ালার গায়ে ঈষৎ হরিতাভ চায়ের ক্ষীণ আভাসটুকু সেই তরুণীরই কপোল দুটির অনুকরণ করিতেছিল; চেরিফুলের পিঠেগুলির বুকের

মাঝে যে মৃদু ঘ্রাণ তাহা সেই তরুণীরই অন্তরখানির আভাস দিতেছিল।

আমি চায়ের পেয়ালাটিতে অধর স্পর্শ করিয়া চুমুকে চুমুকে সুগন্ধি চা আর তারই মাঝে মাঝে শাকুরা-মোচি আস্বাদন করিতে লাগিলাম। কিন্তু চোখ দুটা আমার নিবিষ্ট হইয়াই ছিল সেই তরুণীর তন্বলতায়।

সে ঠিক যেন একটী রজনীগন্ধা ফুল—তেমনি তন্বী, তেমনি শুভ্র, তেমনি নিটোল, তেমনি কোমল, তেমনি মধুর! তাহার মাথায় ফাঁপানো খোঁপা। পরণে চিত্র-বিচিত্র কিমানো (জাপানী পোষাক), যেন একটী প্রজাপতি তাহার বর্ণবহুল ডানা মেলিয়া রজনীগন্ধার গায়ে জড়াইয়া ধরিয়াছে। আমি দেখিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতে-ছিলাম।

অনেক বিলম্ব করিয়াই চায়ের পেয়ালা শেষ করিলাম। তখন আর অপেক্ষা করিবার কোন ছুঁতা খুঁজিয়া পাইলাম না। অগত্যা উঠিতে হইল। চায়ের দাম শোধ করিয়া দিতেই তরুণী অতি মোলায়েম কণ্ঠে বলিল—আরিগাতো! (ধন্যবাদ!)

ইহার উত্তরে আমার কি বলা উচিত ঠিক করিতে না পারিয়া আমি একটু হাসিয়া মস্তক নত করিলাম। সে হাসিতে আমার প্রাণের সমস্ত তরলতা ঢালিয়া দিয়া তরুণীকে বুঝিতে দিলাম—আমি বিদেশী, আমার মুখে ভাষা নাই, কিন্তু সৌন্দর্য্যের সমাদর করিতে পারি এমনতর সরস প্রাণ একখানি এই কালো চামড়ার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে।

আমি বাহির হইয়া আসিতেছি, তরুণীও আমার সঙ্গে সঙ্গে চায়ার দ্বার পর্য্যন্ত আসিল এবং আবার তাহার কণ্ঠস্বরে জগতের সকল মাধুর্য্য মিশাইয়া সে বলিল—সায়ো নারা! আরিগাতো গোজাইমাশ্, মাতা নেগাইমাস্। (বিদায়! ধন্যবাদ মহাশয়! আবার অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন!)

সুন্দরী কি বলিল কিছুই বুঝিলাম না; শুধু ভাবে বুঝিলাম সে বলিল—হে বন্ধু, আজিকার মতন বিদায়; কিন্তু এ বিদায় যেন শেষ বিদায় না হয়, আবার এসো বন্ধু, আবার এসো!

আমি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া চলিয়া আসিলাম।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কত মানুষ আছে, তাহার মধ্যে এক-একজনের সঙ্গে কেমন ক্ষণে দেখা হয় যে তাহাকে আর কিছুতেই ভুলিতে পারা যায় না। সে যে সৌন্দর্য্যের মোহ বা নূতনত্বের মাদকতা ঠিক তা বলা যায় না। প্রাণটা যেন এতদিন তাহারই প্রতীক্ষায় বিরহবেদনা ভোগ করিতেছিল, তাহারই মিলনে হৃদয় মন ভরিয়া উঠে, জীবন ধন্য বোধ হয়।

সামান্য একটি চায়া-ওয়াকে দেখিয়া আমার প্রীতির সাগর যেন উছলিয়া উঠিল; তাহার কোমল রূপ, মধুর বাণী, ললিত ভঙ্গী, সরস সঙ্গ আমার অন্তর যেন তাবে আনন্দে ভরিয়া ছাপাইয়া তুলিল।

মাত্র দুদিন য়োকোহামায় থাকার কথা। এই দুদিনে যতবার পারি তাহাকে দেখিয়া আমার আকুল অন্তরটাকে তৃপ্ত করিয়া লইব ঠিক করিলাম।

সন্ধ্যাবেলা আবার চায়াতে গেলাম। তরুণী আমায় দেখিয়া তাঁহাদের দেশের রীতি অনুসারে দুই উরুতে হাত রাখিয়া ঈষৎ নত হইয়া মধুরকণ্ঠে আমাকে অভ্যর্থনা করিল—কোম্বান্ ওয়া! (শুভ সন্ধ্যা!)।

তাহার মুখে হাসির রেখামাত্র ছিল না, কণ্ঠে প্রকম্প ছিল না, কিন্তু তার ছোট টানা বাঁকা চোখ আমার সাক্ষাৎলাভে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। আমিও তাহাকে শুভ সন্ধ্যা জ্ঞাপন করিলাম।

রাত্রে হোটেলে ফিরিলাম, কিন্তু মন পড়িয়া রহিল সেই চায়ের দোকানে। একটি শাকুরা ফুলের মতো ছোট অথচ পরিপূর্ণ-যৌবনার স্মৃতিটিকে শতপাকে বেষ্টন করিয়া আমার চিত্ত ভ্রমরের মতো গুঞ্জরণ করিতেছিল। এই বিদেশিনীর সকল কথা আমি বুঝি না, আমার একটা কথাও তাহাকে বুঝাইতে পারি না।

কিন্তু এই ভাষাহীন ভাষার অন্তরালে যে কল্পনা যে ভাবপুঞ্জ জমিয়া উঠিতেছিল তাহা বিচিত্র, তাহাই আমার অন্তর বাহির পুলকাঞ্চিত করিয়া তুলিতেছিল।

সমস্ত রাত্রি চায়া-ওয়াকেই স্বপ্ন দেখিলাম। প্রভাতে তাহাকে স্মরণ করিয়াই নয়ন মেলিলাম।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া চায়ার দিকে চলিয়া গেলাম। তখনও প্রভাতের আলো ভালো করিয়া ফুটে নাই, চায়ার দরজা খুলে নাই। মুদ্রিত কমলের চারিদিকে ব্যস্ত

ভ্রমরের প্রবেশ-যাচনার মতো ব্যাকুল চিত্তে আমি তাহার সম্মুখে পদচারণা করিতে লাগিলাম। প্রভাতে দ্বার খুলিল। তরুণী চায়াওয়া আমাকে দ্বারের কাছে দেখিয়া হাসিয়া বলিল—ও হায়ো! (সুপ্রভাত!)

আমিও তাহাকে সুপ্রভাত জানাইয়া মনে মনে বলিলাম—প্রভাতে উঠিয়া শ্রীমুখ দেখিনু, দিন যাবে ভাল ভাল!

দুটি দিনেই আমরা পরস্পরের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিলাম। আমি বুঝিলাম এই তরুণী আমারই জন্ত জগতে আসিয়াছে, আর এই সাত সমুদ্র তের নদীর পারে সুদূর জাপানে ইহারই সহিত মিলনের জন্ত আমার এই অভিসার—বিদ্যার জন্ত নয়, খ্যাতির জন্ত নয়, অর্থের জন্ত নয়—এ আমার প্রেমযাত্রা!

দুদিন গেল। তবু আমার তোকিও যাওয়া হইল না। মনে করিলাম য়োকোহামাতেই কোনো কলেজে বা কারখানায় কিছু একটা শুরু করিয়া দি, তারপর কিছুদিন পরে তোকিয়ো গিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিলেই হইবে। কিন্তু সব-প্রথমে এ দেশের ভাষা শিক্ষা করা

দরকার এই শিক্ষাটুকু আমি চায়া-ওয়ার কাছেই প্রথম লাভ করিলাম।

হোটেলের ম্যানেজারকে বলিলাম—আমায় একজন এমন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিন যে ইংরেজি জানে আর আমাকে জাপানী শিখাইতে পারে।

ম্যানেজার একজনকে আনিয়া দিল। লোকটি গাকুশা অর্থাৎ পণ্ডিত।

আমি প্রথমেই তাহার কাছে প্রেমের পাঠ লইতে আরম্ভ করিলাম। প্রণয়ের অভিধানে যে কথাগুলার খুব চলন সেগুলাই বাছিয়া আমি গাকুশার কাছে প্রথমেই তর্জমা করিয়া শিখিয়া লইতে লাগিলাম।

লোকটাও বেশ রসিক আর প্রণয়-ব্যাপারে অভিজ্ঞ। আমি যেমনটি চাই ঠিক তেমনি করিয়াই আমাকে তালিম করিতে লাগিল।

একদিন গাকুশা হাসিতে হাসিতে আমায় জিজ্ঞাসা করিল—কি হে বিদেশী ছাত্র! নিপ্পনের মাটিতে পা দিতে না দিতে প্রেমে পড়লে না কি?

হাঁ সেন্‌সেই (গুরুমহাশয়)।

কেমন সে তরুণী ?

যেন একটি হাস্নুহানা (চেরি ফুল) পাক্‌শা !

কোথায়, কোথায় এমন নিধি মিল্‌ল ?

কেবল সেইটি বল্‌ব না, পাক্‌শা !

পাক্‌শা একটু হাসিয়া বলিল—আচ্ছা না-ই বল্‌লে। আমি তোমায় প্রণয়ের ভাষায় তালিম্ করে' দেবো, যেন শীঘ্র সফলকাম হও। বিবাহের দিন আমায় নিমন্ত্রণ কর্‌তে ভুলো না যেন।

এমনিতর পরের কাছে নিজের ভাব তর্জমা করিয়া লইয়া মুখস্থ ভাষায় আমার প্রণয় বেশ অগ্রসর হইতে লাগিল। পাক্‌শার সহিতও একটি বেশ সরস বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিল। ক্রমে জানিলাম সেও একজন নূতন প্রণয়ী, তাহারও নাকি একটি ছোট প্রণয়িনী আছে, হাস্নু-নো-হানার মতো স্নিগ্ধ সে, তাই পাক্‌শা আমার ঠিক উপযুক্ত শিক্ষক হইতে পারিয়াছিল।

এমনি করিয়া অনেকদিন গেল। একদিন পাক্‌শা আমায় পড়াইতে আসিয়া খুব হাসিতে হাসিতে বলিল—বন্ধু, বন্ধু, তুমি ধরা পড়ে' গেছ !

আমি ব্যাপার কতকটা আন্দাজ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলাম—কি গাবুশা, কি?

গাবুশা আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—চায়া-ওয়া তোমার প্রণয়িনী তা এতদিন আমায় বলতে হয়। আজ হঠাৎ ঐ পথে যেতে তোমাদের মিলন-মশ্‌গুল্ ভাব দেখে আমি আন্দাজ করে' নিলাম। একথা আমায় আগে বলতে হয়—তাহলে তোমাকেও এত পাঠ মুখস্থ করতে হত না, আমাকেও এত বেগ পেতে হত না। একটি মন্ত্রে সব ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনি হয়ে যেত।

আমি উৎসাহিত হইয়া বলিলাম—কি গাবুশা, সে মন্ত্রটি কি?

এস তোমায় শিখিয়ে দি—বলিয়া গাবুশা সেদিন অনেক যত্নে আমায় নূতন রকমের কতকগুলি কথা মুখস্থ করাইল। তারপর বলিল—এই কথা শুনলে চায়া-ওয়া একেবারে মুগ্ধ হয়ে একান্ত তোমারই হয়ে যাবে।

এই কথা বলিয়া গাবুশা খুব হাসিতে লাগিল।

অতিরিক্ত ঔৎসুক্য ও আনন্দের বশে সেদিন সন্ধ্যার

অন্ধকার ঘনাইতে না ঘনাইতে আমি চায়াতে গেলাম। যথারীতি অভিবাদন ও চা পানের পর আমি চায়া-ওয়াকে খুব নিকটে টানিয়া বসাইলাম—সেই ছোট মানুষটিকে দূরে রাখিলে যেন তাহাকে খুঁজিয়া পাইতাম না ; সে যেন সারারাত্রি জাগিয়া দূরবীণ কষিয়া দেখিবার মতন অতি দূরের জ্যোতিষ্ক, সে যেন টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিবার পুতুল, সে যেন বুকের উপর বোতাম-বিধে সাজাইয়া রাখিবার ফুলটি।

তাহার ছোট হাতখানি আমার হাতের মধ্যে তুলিয়া লইলাম—তখন প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমচিত্র আমার মনে পড়িল। আমি হাসিয়া গাকুশার শেখানো পাঠ তাহার কানের কাছে আবৃত্তি করিলাম।

গাকুশা বলিয়াছিল সে মন্ত্র। বাস্তবিকই সে মন্ত্র! কিন্তু সে মন্ত্র শয়তানের, সে মন্ত্র সর্বনাশের! আমার কথা শুনিবামাত্র সে আমার হাত হইতে হাত ছিনাইয়া লইয়া বড় রূঢ় দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল।

আমি সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে না পারিয়া গাকুশার শেখানো কথার আরো খানিকটা আবৃত্তি করিলাম।

তখন সে ধনুর্নিক্ষিপ্ত বাণের মতো ছিটকাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া ঘৃণা ভৎর্সনা অবিশ্বাস বিস্ফুরিত হইতেছিল।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া আবার গাকৃণার শেখানো পাঠ বলিতে লাগিলাম। তখন চায়া-ওয়া ছুটিয়া গিয়া দোকানের লোকজনদের কি বলিল। অমনি অনেক লোক ছুটিয়া আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া এমন ভাব দেখাইতে লাগিল যে তাহারা আমাকে মারিয়া দোকান হইতে তাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত।

ব্যাপার কি আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না, এবং এমন গণ্ডগোল হইয়া উঠিল যে কাহাকেও কোনো কথা বুঝাইয়া বলিবার বা প্রশ্ন করিবার অবসর রহিল না। এবং দোকানীদের রকম মোটেই না-বুঝিবার মতন নয় বলিয়া আমি জানা না-জানার মধ্যে পড়িয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িলাম।

এমন সময় দেখি ভিড়ের এক পাশে দাঁড়াইয়া গাকৃণা মৃদু মৃদু হাসিতেছে। আমি তাহাকে দেখিয়া যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইলাম। আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—গাকৃণা

গাকৃণা, চায়া-ওয়া হঠাৎ আমার উপর কেন রাগ করেছে? আমি হয়ত কি বল্‌তে কি বলেছি, কিংবা ও-ই হয় ত শুন্‌তে কিছু ভুল করেছে; তুমি আমার কথাগুলো বুঝিয়ে বল গাকৃণা!

গাকৃণা হাসিয়া বলিল—বন্ধু, তুমি কিছুই ভুল বলোনি, ওকুসামাও (মহাশয়াও) কিছু ভুল শোনেনি—তুমি তাকে বলেছ,—তুই কুৎসিত, তুই আমার দাসী হবারও যোগ্য ন'স, তোকে আমি একটুও ভালোবাসি না, তোকে আমি ঘৃণা করি, শুধু তোকে নিয়ে এতদিন একটু তামাসা কর্‌ছিলাম ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া পাংশুল মুখে বলিলাম—সে কি গাকৃণা, আমি তো অমন সব কথা বল্‌তে চাইনি?

গাকৃণা হাসিয়া বলিল—আমি বলাতে চেয়েছিলাম।

আমি উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—সে কি গাকৃণা; সে কি? কেন এমন কর্‌লে?

গাকৃণা তেমনি নির্ব্বিকার ভাবে হাসিতে হাসিতে বলিল—ওকুসামা আমার প্রণয়িনী। তুমি নিপ্পন অপবিত্র

করবার পূর্ব্বেই আমার হৃদয় ওঁর শ্রীচরণে উৎসর্গ করেছি। হয় না-হয় তুমি ওকুসামাকেই জিজ্ঞাসা করো।

এ কী অদ্ভুত সমস্যা! আমি গাকুশাকে বলিলাম—গাকুশা, তুমি ত পরাজিত হয়েছ, এখন ওকুসামা আমার!

গাকুশা হাসিয়া তেমনি নরম ভাবেই বলিল—কক্‌খনো না। যতদিন আমি বেঁচে থাকবো ততদিন না!

এই বলিয়া সে নিজের পেশীপুষ্ট বাহুখানা অনাবৃত করিয়া হাসিতে হাসিতেই আমার সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ধরিল।

আমি বলিলাম—ভয় দেখিয়ো না গাকুশা। তোমার জাপানী জুজিৎসু আছে, আমারও হিন্দুস্থানী কুস্তী আছে। ঠিক্ বলা যায় না কে জিতবে। অতএব একটা রফা করে' ফেল।

গাকুশা তেমনি হাসিতে হাসিতেই বলিল—হৃদয় নিয়ে যেখানে মারামারি সেখানে আবার রফা কি?

আমি মিনতি করিয়া বলিলাম্—গাকুশা, তুমিই ত নিজে আমায় প্রণয়মন্ত্রে শিক্ষিত করে' আমার সফলতায় সহায়তা করেছ, এখন এ বিঘ্ন ঘটাচ্ছ কেন?

গাকুশা হাসিতে হাসিতে বলিল—তখন কি জান্‌তাম যে তুমি আমাকেই আশ্রয় করে' আমারই সর্ব্বনাশ করছ? তোমায় এতদিন অনেক কথা শিখিয়েছি। আজ একটা শেষ শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি, বল—জাকেন নাগায়া জোকো যে ও ওয়াকারে মোশিমাস।

আমি হতাশ ভাবে দুঃখবিমলিন মুখে বলিলাম—গাকুশা, এর অর্থটাও তবে বলে' দাও।

গাকুশা তেমনি হাসিয়া হাসিয়া বলিল—আমি দুঃখিত হইতেছি, আজ এই আমাদের চিরবিদায়!

কালো দেয়ালের আড়ালে, কালো হাব্সীর পাহারায়, কালো আঁধারের মাঝখানে, আমকে একা বন্দী! প্রত্যেক লোকের একটি একটি পৃথক ঘর—এক বাড়ীতে থাকে তাহারা এই পর্য্যন্ত, কেহ কাহারো নাম জানে না, চেহারা দেখে না!

তবু এদের পরস্পরের পরিচয়ের অভাব নাই। দেয়ালের গায়ে আঙুলের টোকা মারিয়া ঘরে ঘরে এদের আলাপ চলে।

আঙুলের টোকার ভিতর দিয়া প্রাণের ভাষা আপনাকে ব্যক্ত করে। এমনি ভাবে কত বন্ধুর সন্ধান মিলে, কত অজানা বন্ধু হয়, কত আলাপ জমিয়া উঠে।

মাঝে মাঝে ঘরের বাহিরের বারান্দায় হাব্সী খোজার নাল-বাঁধানো নাগ্‌রা জুতোর ঠকাস ঠকাস শব্দ যেই তাহাদের কানে আসে অমনি এই নির্ব্বাক আলাপ থামিয়া যায়,—হাব্সী খোজার পায়চারির আওয়াজ আবার যখন দূরে সরে তখন আবার টোকার শব্দে দেয়াল-গুলি মুখর হইয়া উঠে।

চোখে না দেখিয়া, কথা না শুনিয়া, তাহারা টোকার

আওয়াজে বুঝিতে পারে কে কেমন লোক—কাহার প্রাণে কেমন ব্যথা লুকানো আছে, কে বা জ্ঞানী কে বা অবোধ, কে প্রশান্ত কেবা অধীর, কে কোন্ ভাবের কেমন ভাবুক। টোকার ভিতর দিয়া তাহাদের হাসিকান্না, সুখদুঃখ, সান্ত্বনা সহানুভূতি, এঘর ওঘর আনাগোনা করে।

এমনি এক ঘরে বন্দী ছিল এক তরুণী। দোষ শুধু তার রূপ আছে, যৌবন আছে, আর আছে একখানি স্বচ্ছ সরল প্রণয়-পাগল প্রাণ। সে অর্থের কাছে প্রণয়কে, বাদশাহী শাসনের কাছে নারীত্বকে খাটো করিতে পারে নাই, তাইতে সে বন্দী! ভীরু পাখীর মতন পিঞ্জরে অসহায় সে বন্দিনী—তবু তার তনুখানি আনন্দ-উল্লাসে ডগমগ, প্রাণখানি গীতে হাস্যে ভরপুর!

বেচারী যেদিন প্রথম এই কয়েদখানায় আসে—তাহার মনে হইল এ এক নূতনতর মজা! বাদশাহের সে বন্দিনী—তবে তো সে যে-সে লোক নয়! ভাবিতে ভাবিতে তাহার ভারি হাসি আসিল—গলা ছাড়িয়া হাসিয়া উঠিল সে।

তাহার সেই গানের মতন তরল মধুর হাসিখানি শুরু

কারার ঘরে ঘরে যেন অমৃতবৃষ্টি করিয়া গেল। কয়েদিরা সব চমকিয়া কান খাড়া করিল।

হাব্‌সী খোজার মিস কালো মুখের মাঝে লাল লাল চোখ দুটো এক মাল্‌সা কয়লার মাঝে আগুনের দুটো ফুল্‌কির মতন রাগে জ্বলিয়া উঠিল। সে দরজার গায়ে জালির উপর চোখ রাঙাইয়া বলিতে গেল—চোপ রও। কিন্তু সেই আনন্দমূর্তির রূপের নেশায় হাব্‌সী খোজারও ভাবহীন অন্তরে রমণীপ্রভাব সাড়া দিল, কঠিন কুটিল দৃষ্টি তাহার সরল তরল হইয়া পড়িল, চুপ করাইতে গিয়া নিজেই সে চুপ রহিয়া গেল, তাহার কালো পুরু ঠোঁটের উপর সুখাবেশের সরস হাসির রেখা ছাড়া আর কিছু ফুটিল না। আজ এই প্রথম হাব্‌সী শান্ত্রীর কাজের ত্রুটি কিছুতেই আর নিবারণ করা গেল না।

ঘরে ঘরে টোকায় টোকায় প্রশ্ন চলিল—এ কে, এ কে রে? এমন কঠিন জায়গায় এমন মধুর ভুবনভুলানো হাসি হাসে কে রে?

কেহই জানে না—তাহাকে তো কেহই দেখে নাই। এই পর্যন্ত তাহারা বুঝিল সে রমণী—আর সে তরুণী।

সুন্দরী কি না কে জানে! কয়েদি প্রহরী সকলেই নিজেদের মধ্যে রমণীর মধুসঙ্গ অনুভব করিয়া আনন্দিত হইল।

তাহার কামরার পাশে বন্দী ছিল এক তরুণ। কালো কালো চারখানি দেয়ালের মাঝে তাহার জীবনের অনেকগুলি মাস নিরানন্দে নিস্ফল গেছে—তবু তাহার অন্তরের তারুণ্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

যেইমাত্র সেই তরুণীর হাসির ঢেউ তাহার প্রাণের তটে আঘাত করিল অমনি তাহার সমস্ত প্রাণ বসন্ত-স্পর্শে বিপত্র তরুর মতন আপনার তারুণ্যে পরিপূর্ণ সুন্দর হইয়া উঠিল। বিচিত্র ভাব পুষ্পপুটে সুরভির মতো তাহার প্রাণখানি ভরিয়া তুলিল।

সে অনুভব করিল সেই কঠিন দেয়ালের আড়ালে একখানি কোমল প্রাণের মধুর স্পন্দন; সে শুনিতে পাইল পরীর মতন লঘু তাহার পায়ের ধ্বনি, কবিতার ছন্দের মতন তাহার নিশ্বাস! তরুণ তরুণী পাশাপাশি—মাঝে শুধু ব্যবধান একখানি মাত্র দেয়াল! কিন্তু সে-ই কত দুর্লঙ্ঘ্য!

দেয়ালের গায়ে কান পাতিয়া যুবক শুইয়া পড়িল। তরুণীর ওড়্‌নার স্পন্দন, তাহার ভূষণের শিঞ্জন, তাহার আনন্দের গুঞ্জন, সব শোনা গেল। শুধু দেখা গেল না তাহার রূপ !

সে মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিল এ তরুণী না-জানি কেমন ? লতার মতন তন্বী, মূর্চ্ছার মতন মনোহারিণী, ইন্দুলেখার মতন অপরূপ সুন্দরী ! তাহার পরণে নীল পেশোয়াজ, রাঙা আঙিয়া, ফিরোজা ওড়্‌না—বুটিদার, চুমকিওলা, স্বচ্ছ লঘু হাওয়ার মতন। তাহার কালো টানা চোখের কোলে সুর্মা আঁকা, পাতার মতন ঠোঁট দুখানি পানের রসে টুক্‌টুকে, চাঁপার গুচ্ছ হাত দুখানি মেহেদি-মাখা। শুভ্র ললাটে ভ্রূ দুখানি যেন স্বচ্ছ শাদা মেঘের উপর কালো কুচ্‌কুচে রামধনু। পিঠের উপর রেশম কোমল কালো চুলের দীর্ঘ বেণী মুক্তার মালায় বেষ্টিত। মুখখানি তার হাসির মতো, বুকখানি তার ঢেউয়ের ন্যায়। তার হাসি যেন এস্রাজের সুর, কথা যেন সেতারের ঝঙ্কার ! সে সজীব আনন্দমূর্ত্তি ! কয়েদ-খানার তরুণী সে—তার জীবনখানি না জানি কি অসীম

রহস্যে মাখানো,—সে যেন কোন্ স্বপ্ন-লোকের কল্পনা!

তরুণ যুবক আস্তে আস্তে দেয়ালের গায়ে আঙুল দিয়া টোকা মারিল। টোকার মধ্যে সে বলিতে চাহিল—ওগো তুমি কে গা? তুমি তরুণী, তুমি সুন্দরী, তুমি একাকী—এ নির্জন পুরীতে আমার বন্দী-প্রাণের তৃষিত-প্রায় আমি তোমায় দিব, শুধু তোমায় দিব!

তরুণী সেই টোকার শব্দ শুনিল—কিন্তু সেই নির্বাক ভাষা সে বুঝিল না কিছুই। শুধুই এইটুকু সে বুঝিল এই দেয়ালের ওপারে আছে এমন একজন লোক যে তাহার জন্য ভাবিতেছে, যে তাহাকে আপনার করিতে চাহিতেছে, যে তাহার কাছে আলাপ মাগিতেছে। সে কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল শুধু টুক টুক টুক। যত শোনে ততই সেই অস্ফুট ভাষা ব্যক্ততর হয়, তাহার কানে তাহা প্রণয়-সঙ্গীতের মতো বাজিতে থাকে। সে কান পাতিয়া শুনিল একখানি উৎসুক হৃদয় তাহারই জন্য ললিতছন্দে স্পন্দিত হইতেছে। সেও তখন তাহার সরম-সঙ্কোচ ভয়ভাবনায় কম্পিত কোমল আঙুল দিয়া দেয়ালের গায়ে মৃদু মৃদু আঘাত করিল—সে আঘাতে তাহার প্রাণের

সমস্ত প্রাণ বীণার মতো বাজিতে লাগিল। কী যে তার ধ্বনি! কী যে তার অনুরণন!

এমন করিয়া তরুণ ছুটি প্রাণ তাহাদের প্রণয়গান দিনের পর দিন জুড়িয়া পরস্পরকে শোনায়।

তরুণী ক্রমে এই আলাপে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে জানিল না দেয়ালপারের তাহার বন্ধুটী তরুণ কি বৃদ্ধ, বিবাহিত কি অবিবাহিত, এমন কোন্ অপরাধে সে এখানে আজ বন্দী। শুধু সে জানিল দেয়ালপারে একপ্রাণ প্রণয় তাহারই অপেক্ষায় আকুলিবিকুলি করিতেছে; সে তাহার বন্ধু, সে তাহার প্রণয়প্রার্থী!

রাতের পর রাত জাগিয়া তাহাদের এমনি অবুঝ আলাপ চলে। কারাগারের বিজনতা এমনি করিয়া সখ-সোহাগে ভরানো হয়। দেয়ালের পাশে বসিয়া বসিয়া আঙুলের টোকায় আলাপ করিতে করিতে তরুণী তাহার ক্লান্ত মাথাটি দেয়ালের গায়ে রাখে, সুর্বশরীর এলাইয়া দেয়ালে সে ঠেসান দেয়, সেই কঠিন কালো পাষাণ-প্রাচীর যেন তাহারই বন্ধুর প্রণয়কোমল বক্ষপট,—ভাবিতে ভাবিতে সুখাবেশে তাহার বিনিদ্র নয়ন মুদিয়া আসে।

এমনিতর পরিপূর্ণ স্থখের সময় থাকে থাকে সে আপন মনে উচ্চরবে হাসিয়া উঠে, হৃদয় ছাপাইয়া গান ছুটে, সারা ঘরময় লঘুতালে সে নাচিয়া ফিরে। এই আনন্দের অমৃতপরশ কারাগারের সকল লোকের দুঃখ বেদনা যেন মুছিয়া দেয়—হাবস্ত্রী শান্ত্রী এমনতর নিয়মভঙ্গ শাসন করিবার মতন কঠোরতা সঞ্চয় করিতে পারে না।

একদিনকার প্রভাতে একজন কে কয়েদি দরজায় জালি দিয়া দেখিল বাহিরের আঙিনায় "কৎল্" করিবার আয়োজন হইতেছে। দেখিয়া তাহার মুখ শুখাইল, বুক কাঁপিল। তখন টোকায় টোকায় এঘর থেকে ওঘর, ওঘর থেকে সেঘর প্রশ্ন চলিল—কে রে, কে সে হতভাগা যাহার জীবনের অবসান এমনতর আসন্ন?

সবাই নিজেকেই সেই মৃত্যুর নিমন্ত্রিত মনে করিতে লাগিল। সকলেই সঙ্গীদের কাছে বিদায় লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। ক্রমে ক্রমে টোকার শব্দ থামিয়া গেল। সবাই স্তব্ধ—যেন জনপ্রাণী জীবিত নাই, সবাই সেথায় মরিয়াছে।

তরুণীর দেয়ালে আজ তাহার বন্ধুর করাঘাত বড়

কম্পিত, বড় ব্যগ্র, বড় ভক্ত। আগেকার মতন এ চুরি করা প্রণয়বাণী নয়, আজ যেন এ জীবনমৃত্যুর সমস্যা, প্রাণের সকল কথা এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিবার প্রাণপণ এ চেষ্টা, আপনাকে নিঃশেষে নিবেদন করিবার উদগ্র এ আকাঙ্ক্ষা। দেয়ালের গায়ে ঘুসি মারিয়া, লাথি কসিয়া, মাথা ঠুকিয়া পাষাণ-প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিতে সে চায়।

তরুণী কিন্তু বুঝিল না তাহার হৃদয়বন্ধু হৃদয় ভাঙিয়া কি বলিয়া গেল—শুধু সে বুঝিল একটি চুম্বনের শব্দ, একটি বিষাদগভীর দীর্ঘশ্বাস। তারপর সব চুপচাপ।

তরুণী তন্ময়ভাবে বসিয়া রহিল। প্রতীক্ষা করিয়া রহিল আবার তাহার বন্ধু তাহাকে ডাকিবে, আবার তাহার কানে প্রণয়গাথা ঢালিয়া দিবে। কিন্তু বৃথা তাহার আশা, বৃথা তখন প্রতীক্ষা। সমস্ত দিন গেল, রাত্রি ঘনাইল, তবু ত কই পাশের ঘরে কোনো সাড়া শব্দ নাই। সে অজ্ঞাত আশঙ্কায় বিমূঢ় হইয়া বসিয়া বসিয়া কি যে ভাবিতেছিল তাহা সেই জানে না।

তখন বাহিরেও সে কী দুর্যোগ! ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ বজ্র! ঝড়ের হাহাকার, বৃষ্টির ক্রন্দন, বিদ্যুতের জ্বালা,

বজ্রের হুঙ্কার তাহাকে নূতন করিয়া আঘাত করিতে লাগিল। সেই আঘাতে তরুণী চেতনা পাইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

অন্ধকার ঘরের মাঝখানে সে বসিয়া আছে একা। তাহার এতদিনের সঙ্গীর, তাহার দুঃখদিনের বন্ধুর এখনো কোনো সাড়া নাই। সে ধীরে ধীরে দেয়ালের গায়ে টোকা মারিল। তবু কোনো সাড়া নাই। তাহার বন্ধু যখন তাহাকে ব্যগ্রভাবে ডাকিয়াছিল তখন সে সাড়া দেয় নাই, তাই কি বন্ধু রাগ করিয়াছে? সে সোহাগভরে আবার ডাকিল। নাই নাই—কোনো সাড়া নাই। তখন সে দুঃখে অভিমানে কাতর হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া কত কি ভাবিল, ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ঘুম তো কিছুতেই আসিল না। তখন তাহার ভারি একা একা বোধ হইতে লাগিল—এতদিন পরে আজ সে কারাগারে একা বন্দিনী! সে এক-একবার ভাবে—আবার একবার ডাকি; আবার ভাবে,—না, সেই আগে ডাকুক। কিন্তু অভিমান করিয়া আর কতক্ষণ থাকা যায়,—সে বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া

দেয়ালের আঘাত করিয়া ফিরিল—ওগো বন্ধু, কোথায় তুমি, তুমি কোথায়, কোথায় গেলে? বল বল—একবার তুমি একটি কথা বল!

সেই আনন্দময়ীর করুণক্রন্দন আজ সমস্ত কারাগারকে আবার হঠাৎ চমকিত করিয়া তুলিল। হায় হায়! এমন হাসির প্রতিমাকে কাঁদাইল আজ সে কোন্ নিষ্ঠুর! সকল কয়েদি চোখ মুছিল। হাব্‌সী খোজার পায়চারিও ভারি মন্থর হইয়া পড়িল।

আনন্দময়ীর কান্নার খবর বাদ্‌শাহের কানে গেল। আনন্দিত বাদ্‌শাহ তরুণীর ঘরে আসিয়া হাসিয়া বলিলেন—সুন্দরী, এইবার বোধ হয় তুমি আমার বশ মানিবে। এতদিন আমার শাসন হাসিয়া হাসিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছ, সুখের খবর, তোমার চোখে আজ জল পড়িয়াছে। বল সুন্দরী, এখন তোমার কোন্ প্রিয় কার্য্য সাধন করিব।

তরুণী শুধু জিজ্ঞাসা করিল—"পাশের ঘরে যে বন্দী ছিল সে কোথায়?"

"সে নাই।"

"সে কোথায়?"

"জানি না।"

তরুণী ভ্রূকুটি করিয়া কহিল—"এখন ওঘরে কে আছে?"

"কেহ না।"

"তবে আমাকে ঐ ঘরে বন্দী করিয়া রাখিতে আজ্ঞা করুন।"

এবার বাদ্‌শাহ ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন—"এস!"

তরুণী বাদ্‌শাহের অনুসরণ করিয়া পাশের কামরায় গিয়া দেখিল দেয়ালের গায়ে রক্ত দিয়া বড় বড় হরফে লেখা আছে—

আগর্ মন্ বাজ্ বিনম্ রু-এ আয়্-এ-খেশ্‌রা।
তা কেয়ামৎ শুক্‌র্ গুজারম্ কির্দিগার্-এ-খেশ্‌রা।

ওগো আমি যদি আমার প্রতিবেশিনীর মুখখানি একটিবার দেখিতে পাইতাম, তবে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত আমার জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করিতাম!

একটি মেহেদির পাতা

১

গুজরাটের নবাব-দরবারে মাধব মিশ্র সভাকবি। আর জেব-উন্নিসা নবাবজাদী।

কবি থাকেন দরবারে, শাহজাদী থাকেন অন্দরে। শ্বেতপাথরের জালিকাটা পর্দার আড়ালে বসিয়া বসিয়া শাহজাদী শুনেন কবির কাব্য, আর আম্-দরবারে কাব্যছন্দের যতিতালে কবি শুনেন নাজানি কাহার ভূষণশিঞ্জন।

কবি শাহজাদীকে চক্ষে দেখেন নাই; কখনো শুধু শাহজাদীর সবুজ ওড়নার ক্ষীণ ছায়াটুকু শ্বেতপাথরের স্বচ্ছ জালির ভিতর দিয়া একটু ক্ষীণ হাসির আভাসের মতো উঁকি মারিয়া যায়; কখনো বা লাল পেশোয়াজের শোণিত-বরণ আভাটুকু কবির চোখে মদের নেশাটুকুর মতো জড়াইয়া ধরে।

কবির এইটুকু সম্বল, কবির সহিত অলক্ষিতার এতটুকু পরিচয়। কিন্তু কল্পনাকুশল কবি এই ছায়াটুকুকে যখন মূর্তিরূপে গড়িয়া তুলিয়া কোন্ এক অনির্দিষ্ট মানসী সুন্দরীর বন্দনাগীত গাহিতেন তখন মর্মর-জালায়নের অন্তরালে কাহার জরিজড়াও কিংখাবের পোষাক নিজের অন্তরালে একখানি ব্যথিত হৃদয়ের চঞ্চলতার আভাস কবির কানে গুঞ্জন করিত, কাহার ভূষণশিঞ্জন কবির প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিত।

কবিও অমনি সেই অদৃষ্ট সুন্দরীকে লক্ষ্য করিয়া গাহিতেন—সেই ত সুন্দরী যাহার তনুলতা আলিঙ্গন করিয়া জরিজড়াও কিংখাব ধন্য হইয়াছে। সোনালি পাতে মোড়া ছাঁচি পানের খিলির মতো যাহার অন্তরের মধ্যে শুধু রসধারা, যাহার উপরের সোনালি আবরণ অন্তরের প্রণয়রসকে লোকচক্ষু হইতে অন্তরাল করিয়া রাখে, সেই রূপসীর রসরূপ যে না চিনিয়াছে সে যে বঞ্চিত। অয়ি বিভূষণা, আমার এই বন্দনাগীতি তোমারই ভূষণদ্যুতিকে উজ্জলতর করিয়া তুলুক!

শাহজাদী কবির গান শুনিয়া শুনিয়া মনে মনে

বলিতেন—ঠিক বলিয়াছ কবি, আমি সোনালি পাতে মোড়া হাঁচি পান, আমার বাহিরে সোনা—চক্চকে ঝক্ঝকে, অন্তরে নিরাশার শোণিতরস!

ভাবিতে ভাবিতে শাহজাদী শ্বেত পদ্মদলে ভ্রমরের মতো, শ্বেত-পাথরের জালির ফাঁকে কালো কালো টানা টানা সুর্মা-আঁকা চোখদুটি রাখিয়া বাহিরে উঁকি মারিয়া দেখিতেন—সুগৌর সুন্দর কবি তাঁহার হস্ত দুটি লীলায়িত করিয়া বিবিধ ছন্দে কত বিচিত্র গাথা আবৃত্তি করিতেছেন; সে স্বরে কি মাধুর্য্য, কি তেজ! সে মুখে কি কোমলকান্ত উজ্জলতা!

দেখিতে দেখিতে বাদ্শাজাদী গুলাবভরা রুমাল তুলিয়া চোখ মুছিতেন, গোলাপের প্রাণ-চুয়ানো মিঠা গন্ধে দরবারখানি ভরিয়া উঠিত, কবির প্রাণে মদির-আবেশ স্পর্শ করিত। উতলা কবির চেতনা শিথিল হইয়া পড়িত, ছন্দ শ্লথ হইয়া আসিত, বাক্য গদ্গদ হইত আর সভাসুদ্ধ লোক বাহবা বাহবা করিয়া তারিফ করিত।

সে তারিফ কবির কানে পৌঁছিত কি না কে জানে,

কিন্তু শ্বেত-পাথরের জালির আড়ালে বাদ্‌শাজাদীর সমস্ত অন্তর সেই প্রশংসায় নাচিয়া উঠিত।

২

এমনি করিয়া দিন যায়, দিন আসে। নবাব-দর্‌বার রাজনীতির পাকচক্র হইতে দিনের মধ্যে একবারের জন্ত আপনাকে মুক্ত করিয়া কাব্যকথায় আত্মহারা হয়। কিন্ত কোথায় কোন্ হৃদয়তলে গোপনে কি ঝড় ঘনাইয়া উঠিতেছে তাহার খবর আনন্দবিহ্বল রাজসভা কিছুই রাখিত না।

আর কবি? তিনি নিজের তরুণ কল্পনায় যে অলক্ষিতার অভিষেক করিতেছিলেন, খেলার ছলে যাহার রূপবহ্নিকে ঘিরিয়া তাঁহার কবিত্বের আহুতি ঢালিতেছিলেন, সে যে ভাবাবেশে অন্তরে অন্তরে পুড়িয়া মরিতেছিল এ খবর ভাবভোলা কবিও রাখিতেন না। তিনি তাঁহার অন্তরের সমস্ত কবিত্বরসধারা একজনকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া নিজেরই মানসীর চরণবন্দনা করিতেছিলেন; কিন্তু তাহা যে নিজের বলিয়া ভুল করিয়া অপরে

কুড়াইয়া কুড়াইয়া অন্তর-নিভৃতে সঞ্চিত করিতেছিল সে খবর কবি জানিতেন না।

একদিন কবি নিজের কুঞ্জঘেরা কুটীরখানিতে বসিয়া নূতন গান রচনা করিতেছেন, এমন সময় বাদশাজাদীর খাস বাঁদি দরিয়া-বিবি কবির সম্মুখে আসিয়া হাসিতে হাসিতে সমস্ত দেহখানি লীলায়িত করিয়া সেলাম করিল।

কবি বলিলেন, "কি দরিয়া-বিবি, এ গরিবখানায় তস্‌রিফ আনিয়াছ কি মনে করিয়া?"

"খবর আছে কবি খবর আছে" বলিয়া দরিয়া-বিবি সমস্ত দেহখানি বেতসলতার মতো দুলাইয়া কবির সম্মুখে তাহার করপুট প্রসারিত করিয়া ধরিল।

তাহার হাতের উপর জরিজড়াও কিংখাবের রুমাল ঢাকা কি?

কবি রুমাল খুলিয়া দেখিলেন—একখানি সোনার রেকাবে সোনালি তবকে মোড়া একখিলি ছাঁচি পান।

দরিয়া হাসিয়া বলিল "কবিকে বাদশাজাদীর নজর!"

বিহ্বল কবি সব বুঝিলেন। তিনি যে খেলা-করিবার ছলে একজনের ঘরে আগুন দিয়া নিজের পথ আলো

করিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

বিষণ্ণ ব্যথিত কবি বলিলেন "দেখ দরিয়া, আমি বাদ্‌শাজাদীর দাস—আমি তাঁহার গুণগান করিয়াছি, রূপের প্রশংসা করিয়াছি, আমি তাহাতেই আনন্দ পাইয়াছি, আর কিছু চাহি নাই। বাদ্‌শাজাদী আমাকে প্রণয় দিয়া বরণ করিবেন তার উপযুক্ত আমি নই।"

প্রত্যাখ্যান-ব্যথিতা দরিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। সেদিন আর কবির রচনায় রস দানা বাঁধিল না।

৩

পরদিন দরবার-শেষে কবি কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, নব নব গানে সভাগৃহ ধ্বনিত করিয়া তুলিলেন না।

নবাব বলিলেন "কি কবি? তোমার আর্জি কি?"

কবি মস্তক নত করিয়া নবাবের সম্ভাষণ গ্রহণ করিয়া বলিলেন "জাঁহাপনা, আমি কিছুদিনের জন্য ছুটি চাই।"

"কবি, এমন অসময়ে ছুটির আর্জি কেন? বসন্তকাল

সমাগত প্রায়, কাব্যরসে তুমি দরবার মাতাইয়া তুলিবে, না, এখন তোমার ছুটির আর্জি? একি কবি, ব্যাপার কি?"

"হুজুর, আমার রসের পুঁজি ধার-করা। এখন একটা নিজস্ব ভাণ্ডার না হইলে চলিতেছে না। আমি তাই বিবাহ করিব।"

বাদশাহের মুখ কৌতুকহাস্যে উজ্জল হইয়া উঠিল; সমস্ত সভার সকৌতুক দৃষ্টি লজ্জাবিনম্র তরুণ কবিকে অভিনন্দন করিল। বাদশাহ হাসিয়া বলিলেন "কে সে ভাগ্যবতী, যে নবাব-দরবারের খাস কবির রসের রসদ যোগাইবে? কে সে কবি, কে সে?"

সমস্ত দরবার রুদ্ধ নিশ্বাসে উন্মুখ প্রতীক্ষায় কবির মুখের পানে চাহিল! শ্বেতপাথরের জালির ফাঁকে কস্তূরীবাসিত কাহার নিশ্বাস আকুল প্রতীক্ষায় আশা-আশঙ্কায় বড় ঘন ঘন কবির কানে আসা-যাওয়া করিতে লাগিল।

কবি বাদশাহকে কুর্নিশ করিয়া বলিলেন "জাঁহাপনা,

সে আমারই উপযুক্ত, দরিদ্রা পল্লীকন্যা। এর বেশি তার পরিচয় দিবার কিছু নাই।"

বাদ্‌শাহ হাসিয়া বলিলেন, "সাবাস কবি! অন্তরের পরিপূর্ণতা তোমাদের বাহিরের রিক্ততা ভরিয়া তুলিবে। আজিকার খবর বড় খুশির খবর, কবি!"

দরবার আনন্দপুলকে চঞ্চল মুখর হইয়া কবিকে অভিনন্দন করিল। কেবল শ্বেতপাথরের জালির আড়াল হইতে কোন রূপসীর ব্যথিত চিত্তের দীর্ঘনিশ্বাস কবির কানে সূচীর মতো আঘাত করিয়া গেল কে জানে?

কবি অনুভব করিতেছিলেন কাহার দুটি কালো চোখ ব্যথিত প্রাণের বেদনা বহিয়া তাঁহারই পৃষ্ঠে করুণ কাতর দৃষ্টি হানিতেছে; কাহার জাফ্‌রানরাঙা ঠোঁটদুখানি ব্যথিত অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে; কাহার ক্ষুব্ধ হৃদয় কাঁচুলির কঠিন কারা ভাঙিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে; কাহার মেহেদিরাঙা হাত দুখানি দুঃসহ বেদনাভরে নির্জনে নিপীড়িত হইতেছে!

কবি অনুভব করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছিলেন, আপনাকে লুকাইতে চাহিতেছিলেন। বাদ্‌শাহ কবির

ছুটি মঞ্জুর করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন; কবি মুক্তি পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু অন্দরমহলে কাহার পায়ের পাঁয়জেব গুঞ্জরি মর্মবেদনায় গুমরিয়া গুমরিয়া পরিণয়-উৎসুক কবির কানে কি কথা গুঞ্জরিয়া গেল।

কবি গৃহে আসিয়া যাত্রার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় বাদ্‌শাজাদীর খাস বাঁদি দরিয়া-বিবি আসিয়া হাজির। দরিয়া কবিকে নীরবে গম্ভীরভাবে সেলাম করিল।

বাদ্‌শাজাদীর বাঁদিকে দেখিয়া কবির মুখ শুকাইয়া গেল, অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। কবি আপনার বেদনাটিকে লঘু ও তুচ্ছ করিয়া ফেলিবার জন্ত সকল হৃদয়ের চেষ্টায় শুষ্ক কাতর অন্তরটিকে নিপীড়ন করিয়া একবিন্দু রহস্তরসে আপনার বাক্যগুলি পরিসিক্ত করিয়া বলিলেন "কি দরিয়া-বিবি, অসময়ে কূল ছাপাইয়া দরিদ্রের কুটীরে আজ আবার কোন্ আনন্দপ্লাবন বহন করিয়া আনিয়াছ?"

দরিয়া আজ বড় গম্ভীর, সে উদাসভাবে বলিল "আনন্দপ্লাবন নয় মিশিরজী! হৃদয়-ভাঙা শোণিতরাঙা খুনের খবর এনেছি!"

দরিয়া তাহার হাত দুখানি প্রসারিত করিয়া ধরিল।

তাহার করপুটের উপর লাল রঙের রুমালে ঢাকা আজ আবার কি?

দেখিতে কবির কৌতূহল হইল না, রুমাল তুলিতে হাত সরিল না, কবি নিস্পন্দ নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া।

দরিয়া নিজেই রুমাল সরাইয়া ফেলিল!

কবি দেখিলেন—একখানি মাটির সরায় সোনার তবকে মোড়া হাঁচিপান—হেঁচা,—তাহার অন্তর কাটিয়া শোণিতধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

কবি অশ্রু মুছিতে মুছিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

৪

কবি বিবাহ করিয়া ফিরিয়াছেন।

নবাব বলিলেন "কবি, আজ তোমার নূতন রসের নূতন গান শুনাও।"

কবি গাহিতে লাগিলেন—সেই ত রূপ যা প্রসাধনের অপেক্ষা রাখে না, যা স্বভাবসুন্দর। কমলিনীকে মোতিবোনা সোনার কাপড় পরাইতে হয় না, সামান্ত

শৈবালেও তাহার রমণীয়তা বৃদ্ধি পায়। ভূষণ রূপকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে, বাহুল্য সৌন্দর্য্যকে আড়ষ্ট করিয়া তুলে।

এইদিন হইতে গান করিতে করিতে কবির মনের মাঝে একটি ভূষণরিক্ত অনিন্দ্য হাস্যমণ্ডিত মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিত, কবি ভাবে তন্ময় হইয়া গাহিতেন। আরাধ্যকে পূজা করিয়া ভক্তের যে আনন্দ তাহাতেই কবি বিহ্বল আত্মহারা হইতেন; তাঁহার গানে বিলাসের চটুলতা, ঐশ্বর্য্যের আবিলতা নাই, তাহা তাপসকন্যার মতো রিক্ত শুভ্র শুচি। কবি এই এক অনাস্বাদিত নূতন আনন্দে টলটল করিতেন, কোথায় কাহার মনে ব্যথা বাজিত, কাহার মনে তাঁহার পূর্ব্বের গানের সহিত বর্ত্তমানের গান তুলনায় বি-সম বোধ হইত, তাহার খবর কবি আর রাখিতেন না।

আর বাদ্শোজাদী! কবির নূতন গান শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার অঙ্গের আভরণগুলি তাঁহাকে লজ্জা দিত, ধিক্কার দিত। তিনি সেই অভূষণা অপরিচিতার অভিনব মূর্ত্তি দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। আজন্ম বিলাস-

প্রাচুর্য্যে পালিতা বাদ্শাজাদী ঠিক বুঝিতে পারিতেন না ভূষণ বিনা সৌন্দর্য্য, সে না জানি কিরূপ, যাহার প্রশংসায় কবি আজ আত্মহারা! সেই সৌভাগ্যবতী কেমন না জানি, যাহার রিক্ত সৌন্দর্য্যে কবি-হৃদয় মুগ্ধ! বাদ্শাজাদীর ঐশ্বর্য্য যে হৃদয় জয় করিতে গিয়া অপমানে পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই হৃদয় বিনা পণে যে জয় করিয়াছে, সে না জানি কেমন! কেমন কুহকিনী, কেমন বিজয়িনী সে! বাদ্শাজাদীর সকল জহরাত দিয়া একটি পল্লীকন্যার সহিত যদি ভাগ্যবিনিময় হইতে পারিত!

৫

বসন্তকাল। নবীন ঐশ্বর্য্যে প্রকৃতির রাজভাণ্ডার পরিপূর্ণ। গাছে গাছে কচিপাতা, পুষ্পমুকুল, পাখীর গান। বসন্তের মোহন স্পর্শের যে আনন্দ কাঠ ভেদ করিয়া গোলবস্পর্শ পত্রে পুষ্পে আপনাকে প্রকাশ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতেছে, তাহা মানুষের প্রাণকে একেবারে অধীর করিয়া তুলিয়াছে। দেশময় নরনারী বাৎসরিক বনভোজনের উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। তরুণ-তরুণীর কলহাস্যে

আমলকী-বন মুখরিত; সখাসখীর মিলনানন্দে আমলকী-কুঞ্জ পুলকিত!

কবিপ্রিয়া সন্ত বিবাহে উজ্জ্বল আনন্দে বনভোজনের উৎসবটিকে সকল প্রাণ দিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে।

একদিন অকস্মাৎ তাহার নিকট আসিল বাদ্‌শাজাদীর মোহরমারা জাফ্‌রানরঙা এক পত্র।

ভয়ে ভয়ে শোণিতবরণ গালার মোহর ভাঙিয়া খামের হৃদয় চিরিয়া কবিপ্রিয়া পড়িল বাদ্‌শাজাদীর রহস্যভরা ছোট চিঠি—

"পরম সৌভাগ্যবতী ভগিনি, তোমাদের বাৎসরিক বনভোজন-উৎসবে আমার নিমন্ত্রণ তোমার কাছে।—ইতি হতভাগিনী জেবউন্নিসা।"

একি!—এ রহস্য! বাদ্‌শাজাদী যাচিয়া নিমন্ত্রণ লইতেছেন সামান্য পল্লীললনার কাছে! কবিপ্রিয়া হাসিয়া আকুল। কিন্তু কবি হইয়া গেলেন ম্লান বিষণ্ণ।

আমলকীবনে বাদ্‌শাজাদী আজ কবিপ্রিয়ার অতিথি।

কবিপ্রিয়া কোমরে ওড়না জড়াইয়া অতিথি-পরিচর্যায় ব্যস্ত।

স্বহস্তে বিবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিতেছে। আর বাদ্শাজাদী দূরে বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া তাহার লীলাভঙ্গী দেখিতেছেন। সমস্ত দিন বৃষ্টির পরে দিনান্তের রৌদ্রটুকুর মতো নবাবজাদীর হাসি, সে হাসির তুলনায় কবিপ্রিয়ার প্রাণভরা উচ্ছ্বসিত উল্লাস প্রভাতরৌদ্রের মতো জলজল করিতেছিল। বাদ্শাজাদীর দৃষ্টি হইতে একটি গভীর বেদনাভরা প্রীতি কবিপ্রিয়ার প্রত্যেক [illegible]ক অভিনন্দন করিতেছিল।

বেলা হইল। আমলকীর ঝালরকাটা পাতার ফাঁকে ফাঁকে চেরা চেরা রৌদ্রছায়া খেলা করিতেছিল। তুলির মতো আমলকীর ফুলগুলি রৌদ্রতাপে কোমল শিথিল হইয়া মিষ্ট ঘ্রাণের নিশ্বাস ফেলিতেছিল। বড় বড় মুক্তার মতো আমলকীর ফলগুলিতে রৌদ্র লাগিয়া লাবণ্য উছলিয়া পড়িতেছিল।

জেবউন্নিসা দেখিয়া দেখিয়া হাসিতে হাসিতে এক-একবার বলিতেছিলেন "বহিন, ঢের রান্না হইয়াছে, আমি একদিনে আর কত খাইব? চল আমরা স্নান করিয়া আসি।"

এ কথার উত্তরে কবিপ্রিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া কটাক্ষ হানিয়া শুধু একটু একটু হাসিতেছিল।

বাদ্‌শাজাদী মুগ্ধনেত্রে দেখিয়া দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "বহিন, রাগ্না ছাড়, নহিলে আমি সব ছুঁইয়া দিব।"

কবিপ্রিয়া হাসিয়া রন্ধন সমাপ্ত করিল।

বাদ্‌শাজাদী কবিপ্রিয়ার সঙ্গে বাউলিতে স্নান করিতে

সোপানে পা ফেলিয়া ফেলিয়া লীলাঙ্কিত

গতিতে উভয়ে গভীর কূপের তলে নামিয়া গেলেন। কবিপ্রিয়া আপনার পরিচ্ছদ খুলিয়া সোপানে রাখিল, বাদ্‌শাজাদীও দেখাদেখি আপনার মণিমাণিক্যে খচিত জরিজড়াও খুলিয়া খুলিয়া সোপানে রাখিলেন। তারপর উভয়ে জলে নামিয়া গল্পে হাস্তে পরিহাসে তন্ময় হইয়া অবগাহন করিতে লাগিলেন।

বাদ্‌শাজাদী হঠাৎ জল ছাড়িয়া উঠিয়া কবিপ্রিয়ার পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ পরিতে লাগিলেন। বিস্মিতা কবিপ্রিয়া বলিল "ওকি বহিন, আমার কাঁপড় পর কেন?"

বাদ্‌শাজাদী একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন "একদিন ছিল, তোমার কবি আমার জরিজড়াওয়ের গুণগান

করিতেন। এখন শুনি তোমার এই সাদা পোষাকের স্তুতি। তাই বহিন, একবার পরিয়া দেখি।”

কবিপ্রিয়া লজ্জিত হইয়া বলিল “বহিন, তুমি বাদ্‌শাজাদী, তাতে তোমার দুঃখ কি ?”

বাদ্‌শাজাদী হাসিয়া বলিলেন—

“দর্ নিহাঁ খুনম্, জাহির্ গর্‌চে রঙ্গ-ই-নাজুকম্।

রঙ্গ-ই-মন্ দর মন্ নিহাঁ, চুঁ রঙ্গ-ই-সুর্‌খ্ আন্দর্ হেনাস্ত্।

ওগো যেজন মেহেদির শুধু বাহির দেখে সে জানে মেহেদি তাজা সবুজ ; কিন্তু যেজন মেহেদির অন্তরের সংবাদ রাখে সে জানে তাহার অন্তর শোণিতপাতে লালে লাল।”

দুকূলহারা

বড়দিন উপলক্ষ্যে কলেজের ছুটি হইয়াছে; কিছু করিবার নাই। শীতকালের মধ্যাহ্নে ঘুমাইলে অসুখ বোধ হয়, চুপ-চাপ অলসভাবে বসিয়া থাকাও যায় না। অগত্যা আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া টো টো করিয়া ঘুরিয়া দিনগুলাকে ফুঁকিয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিলাম। পালা করিয়া কোনো দিন আলিপুর চিড়িয়াখানায়, কোনো দিন বা ম্যুজিয়মে, এবং কোনো দিন বা পরেশনাথের বাগানে অনাবশ্যক হল্লা করিয়া মধ্যাহ্ন যাপন করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে হাতের কাছে যতগুলি গম্য স্থান ছিল সব ঘুরিয়া শেষ করিলাম, কিন্তু তখনো দেখি অনেকগুলা অলস মধ্যাহ্ন অবশিষ্ট থাকিয়া অবসানের প্রতীক্ষা করিতেছে। তখন স্থির করা গেল শিবপুর কোম্পানীর বাগানে যাইতে হইবে।

আমরা পাঁচ বন্ধু মিলিয়া শ্যামবাজার হইতে ট্রামে

সওয়ার হইয়া চাঁদপাল ঘাটে উপস্থিত হইলাম এবং অনেক দরদাম কষাকষি করিয়া একখানা পান্সি ভাড়া করিলাম। নৌকাব্যূহ ভেদ করিয়া পান্সি গঙ্গার মাঝখানে উপস্থিত হইল। জোর জোয়ারের প্রতিকূলে ঝিঁকার চোটে নৌকা খুব দুলিয়া দুলিয়া ধীর মন্থর গমনে চলিতে লাগিল। মাঝিরা বাঙালী। তাহারা কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। আমরাও তাহাদের গৃহপরিবার, সুখদুঃখ, আয়ব্যয় ইত্যাদির পরিচয় লইতে লাগিলাম। যে মাঝি হাল ধরিয়া ঝিঁকা মারিতেছিল, তাহার বাড়ী শুনিলাম রাণাঘাটের কাছে। কিন্তু তাহার বাংলা উচ্চারণ অতি অদ্ভুত রকমের। আমরা বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে একজন মাঝি বলিল, "ও অনেক দিন দ্বীপান্তরে ছিল, তাই ওর কথা অমন হয়ে গেছে।" আমাদের কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল। কেন দ্বীপান্তর গিয়াছিল? সেখানে কেমন ছিল? সেখান হইতে কবে ফিরিল? ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। সেই মাঝি বলিল, "বাবু, সে অনেক কথা, বলি শুনুন।"

আমরা মাঝির কথা শুনিতে শুনিতে একাগ্র মনে

কয়লাপেন্ধু ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, মাঝি গল্প বলিতে আরম্ভ করিল।

ওর নাম অর্জ্জুন। অর্জ্জুন যৌবনে খুব বলিষ্ঠ ছিল, তাহা তাহার বৃদ্ধশরীরের কাঠামো দেখিলেই অনুমান করা যায়। গায়ে যেমন বল ছিল, মনেও তেমনি সাহস ছিল, ভয় বলিয়া সে কিছু জানিত না। বিষম গোঁয়ার বলিয়া গ্রামে তাহার খ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল। উহার বয়স যখন পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর, তখন তাহার গ্রামের জমিদারের সঙ্গে আরএক পার্শ্ববর্ত্তী-জমিদারের সীমানা লইয়া বিবাদ বাধে। এই উপলক্ষ্যে খুব একটা দাঙ্গা হয়। অর্জ্জুন শুধু পেট ভরিয়া মদ খাইতে পাইবার লোভে এবং বীরত্ব দেখাইবার প্রলোভনে পড়িয়া পরিণাম চিন্তা না করিয়াই সেই দাঙ্গায় যোগ দিয়াছিল। ফলে, খুনের দায়ে পড়িয়া আরো পাঁচজনের সঙ্গে দায়রার বিচারে অর্জ্জুনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইল। তাহার বাড়ীতে অসহায়া পড়িয়া রহিল তাহার শোকবিহ্বলা বৃদ্ধা মাতা ও সদ্য-বিবাহিতা বালিকা স্ত্রী।

আন্দামানে গিয়া অর্জ্জুনকে কিছুদিন সেখানকার

পারদে থাকিতে হয়। তৎপরে সে মুক্তি পাইয়া সেই দ্বীপেই স্বাধীন ভাবে থাকিবার অধিকার পাইয়াছিল। সেই সময়ে একটি বাঙালিনীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। সেই সুদূর অপরিচিত সমুদ্রমেখলা দ্বীপে যাবজ্জীবনের জন্য স্বদেশ ও স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বজাতীয় একটি লোককে দেখিয়া চিরপরিচিত বন্ধুর মতো বোধ হইয়াছিল। অল্পদিনের মধ্যে উভয়ে চিরআত্মীয়ের মতো পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল এবং স্বামী-স্ত্রীর মতো একত্রে ঘরকন্না পাতিয়া বাস করিতে লাগিল। তবু মাঝে মাঝে সেই আজন্মপরিচিত, স্নেহে অভিষিক্ত, আদরে মধুর গ্রাম্য কুটীরখানির মধ্যে সর্ব্বউপদ্রবসহা মার শান্ত মুখচ্ছবি মনে পড়িয়া অর্জ্জুনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত।

আর সেই স্ত্রীলোকটি—তাহার নাম ক্ষীরোদা—সে ব্রাহ্মণের মেয়ে, ভদ্রঘরের কুলবধূ! দেশে তাহারও ত পাতানো সংসার জাজ্বল্যমান বজায় আছে। স্বামীর ঘরে সতীনের জ্বালায় তাহার সুখ ছিল না বটে, কিন্তু তাহার বাপের বাড়ীতে বাপের আদরে, মায়ের স্নেহে, ভাইয়ের প্রীতিতে পরিপূর্ণ মধুর ছিল। থাকিলে কি হয়, তাহাতে

তাহার সুখ ছিল না। স্বামীসোহাগে বঞ্চিতা হইয়া ক্ষীরোদার নারীহৃদয় অতৃপ্তিতে ক্ষুধিত হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল। রমণী বাপের বাড়ীতে যত আদরেই থাকুক না কেন, সেখানে সে আপনাকে পরবাসিনী বলিয়াই মনে করে; আজন্মের আশ্রয়টিকে তাহার পরাশ্রয় বলিয়া মনে হয়; চিত্তের মধ্যে একটা হীনতার ক্ষোভ, একটা আহত অভিমানের অতৃপ্তি জাগিয়া উঠে। ক্ষীরোদা স্বামীগৃহের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে দেখিয়া সহ্য করিতে পারে নাই। বাপের বাড়ীর অজস্র অযাচিত স্নেহ সত্ত্বেও সে আপনার স্বামীগৃহের শরিক সতীনকে উপেক্ষা করিয়া, স্বামীর পক্ষপাত সহ্য করিয়া, আপনার গৃহে আপনার ন্যায্য অধিকার ত্যাগ করিতে পারে নাই। একদিন কলহপ্রসঙ্গে আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া ক্ষীরোদা একখানা দা দিয়া সতীনকে আঘাত করিল। তাহার দুর্ব্বল আঘাতে সতীন ত মরিল না, সেই কেবল সকল স্নেহবন্ধন হইতে, আপনার সমাজ ও স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অসংখ্য অপরিচিত নরনারীর মধ্যে নির্ব্বাসিতা হইল। ক্ষীরোদা বাঙালীঘরের কুলবধূ, বহিঃসংসারকে সে ত গুণ্ঠন দিয়া একেবারে

আড়ালে রাখিয়াছিল; অকস্মাৎ শাসন হইতে মুক্তি পাইয়া অদেখা দেশে অদেখা নরনারীর মধ্যে সে আপনার স্বাধীনতা লইয়া মহা মুস্কিলেই পড়িল। তাহার করেদই যে ছিল ভালো, সেটা যেন তাহার চিরাভ্যস্ত শ্বশুরবাড়ীর মতোই বোধ হইতেছিল। অনভ্যস্ত স্বাধীনতা পাইয়া সে বিষম গোলে পড়িল, আপনাকে নিতান্ত অসহায়া ও একাকিনী বোধ করিতে লাগিল। এই সময়ে ভাগ্যক্রমে সে অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইল। একজন বাঙালীকে পাইয়া সে যেন মহাসমুদ্রে কূল দেখিল। অর্জ্জুন বাগ্দী বাংলা দেশে ক্ষীরোদার অস্পৃশ্য। কিন্তু আজ এই যমঘারে আসিয়া বাগ্দী-ব্রাহ্মণের কৃত্রিম পার্থক্য ঘুচিয়া গেল; আজ উভয়ে পরস্পরের স্বদেশী; উভয়ে বিরাট নরসমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়; নিঃসঙ্গ প্রবাসে উভয়ে উভয়ের অবলম্বন। ক্ষীরোদা অর্জ্জুনকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। অর্জ্জুন ক্ষীরোদার আদর-যত্নে একান্ত তাহার অনুগত হইয়া আপনার উদ্দাম বর্ব্বরতা ভুলিতে লাগিল। তথাপি এই নূতন পাতানো ঘরকন্নার মধ্যেও ক্ষীরোদার পুরাতন সুখদুঃখের স্মৃতি শত উপলক্ষ্য ধরিয়া দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলিত। সেই পল্লীসঙ্গীদের সহিত উদ্দাম আনন্দ সম্ভোগের জন্য অর্জ্জুনের মনও মাঝে মাঝে ব্যাকুল হইয়া পড়িত, আর যখন-তখন তুচ্ছ উপলক্ষ্য ধরিয়া মনে পড়িত তাহার সেই বুড়ী মাকে ; বালিকা স্ত্রীর স্মৃতি অর্জ্জুনের মনে কোনো ভাবান্তর ঘটাইতে পারিত না।

এইরূপে বহুদিন কাটিয়া গেল। মহারাণীর জুবিলি উপলক্ষ্যে অর্জ্জুন মুক্তি পাইল। ক্ষীরোদা মুক্তি পাইল না। অর্জ্জুন মহা বিপদে পড়িয়া গেল। দুস্তর সাগরের একপার হইতে তাহার মাতার পুরাতন স্নেহ তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিল, আর এক পারে তাহার নূতন পাতানো ঘরকন্নার মধ্য হইতে ক্ষীরোদার আসক্তি তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সে কাহাকে ত্যাগ করিয়া কোন্ দিকে যাইবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না। এর চেয়ে তাহার বন্দীদশায় সে যে ছিল ভালো, নিশ্চিন্ত আরামে তাহার দিন ত কাটিত! কিন্তু মোটানায় এখন তাহার এ কি লাঞ্ছনা!

এদিকে অর্জ্জুনের মা জমিদার-বাবুর নায়েব মহাশয়ের কাছে পুত্রের মুক্তি-সংবাদ পাইয়া কাঁদিয়া আকুল হইল,

পুত্রের সহিত মিলনমাত্রবিযুক্তা বধূর গলা ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুড়ী তাহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিল।

বুড়ী পুত্রের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় দিন গণিতে লাগিল। কিন্তু মাসের পর মাস গেল, কই তাহার নির্ব্বাসনমুক্ত পুত্র আপন গৃহে মায়ের কোলে ফিরিয়া ত আসিল না। বুড়ী কাঁদিয়া-কাটিয়া নায়েব মহাশয়কে ধরিয়া পুত্রকে চিঠি দিল, ব্যাকুল হইয়া মিনতি করিয়া আহ্বান করিল। অর্জ্জুন চিঠির জবাব দিল বটে, কিন্তু ক্ষীরোদাকে অসহায় ফেলিয়া কিছুতেই দেশে মায়ের কাছেও ফিরিতে পারিল না।

কিছুদিন পরে অর্জ্জুন নায়েব মহাশয়ের আর-এক চিঠি পাইল। তিনি লিখিয়াছেন, তাহার বুড়া মা মরমর, অন্তিমকালে একবার পুত্রকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে।

অর্জ্জুন আর থাকিতে পারিল না; যে খুনে, তাহারও প্রাণ মায়ের অন্তিম ডাক শুনিয়া অধীর হইয়া উঠিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষীরোদার হাত দুখানি ধরিয়া বলিল "ক্ষীরো, মা মরে, আমায় ত তবে যেতে হয়।"

হায়! ক্ষীরোদা কেমন করিয়া বারণ করিবে, আর প্রাণ ধরিয়া কেমন করিয়াই বা এই নিতান্ত অপরিচিত দেশের একটিমাত্র আশ্রয় সে ত্যাগ করিবে! সে কিছু বলিতে পারিল না, অর্জ্জুনের বিশাল বক্ষে আপনার ক্ষুদ্র মুখ চাপিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল। অভাগিনীর আজ দ্বিতীয়বার নির্ব্বাসন হইতেছে।

অর্জ্জুন অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে ক্ষীরোদার নিকট বিদায় লইয়া স্বদেশে যাত্রা করিল। যতক্ষণ আন্দামানের উপকূল মসীলেখার মতো দেখা যাইতেছিল ততক্ষণ অর্জ্জুন জাহাজ হইতে অশ্রুপরিম্লান দৃষ্টিতে শুধু তাহাই দেখিতেছিল। অবশেষে কূল অদৃশ্য হইলে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন-আবেগে জাহাজের ডেকের উপর লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। দুদিন আগের এই ভীষণ নির্ব্বাসনদেশ আজ একটি নারীচিত্তের মোহন প্রেমে মণ্ডিত হইয়া মহীয়ান ও পরম আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। যে-দেশে আসিতে তাহার বুক কাঁপিয়াছিল সেই দেশ ছাড়িয়া যাইতে আজ বুক ফাটিয়া যাইতেছে।

অর্জ্জুন কাঁদিতে কাঁদিতে দেশে পৌঁছিল। মাতার

অন্তিম শয্যার পার্শে বসিয়া বালকের মতো কাঁদিল। বুড়ী অর্জ্জুনের মাথায় মুখে কম্পিত হস্ত বুলাইয়া "বা—বাঃ" বলিয়া ইহজীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

মাতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া অর্জ্জুন যখন একটু শোক সাম্‌লাইতে পারিল তখন সে দেখিল তাহার স্ত্রী—যাহাকে একটুখানি বালিকা দেখিয়া গিয়াছিল—এই পনর বৎসর ধরিয়া নিটোল পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও যৌবন সঞ্চয় করিয়া তাহারই জন্ত অর্ঘ্য সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছে। শাশুড়ীর কাছে মায়ের স্নেহযত্ন পাইয়া সে সুখে ছিল; স্বামীকে সে চিনিত না, স্বামীকে সে চাহেও নাই। এখন শাশুড়ীর অভাবে সে অর্জ্জুনকেই আপন বলিয়া চিনিতে লাগিল। এখন অর্জ্জুনই তাহার আশ্রয়, সেই তাহার একমাত্র অবলম্বন। অর্জ্জুনের কিন্তু মাঝে মাঝে সেই দ্বীপান্তর-বাসিনী অভাগিনী ক্ষীরোদাকে মনে পড়িত; সে তখন ভালো করিয়া স্ত্রীর সহিত মিলিতে পারিত না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে অর্জ্জুনও স্ত্রীর সাহচর্য্যে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। ক্ষীরোদার স্মৃতি আছে-না-আছে হইয়া গেল।

কুড়ি বৎসর নির্ব্বাসনে থাকিয়া ক্ষীরোদাও অবশেষে

মুক্তি পাইল। সে পরম আগ্রহে, একবুক আশা উৎসাহ আনন্দ বহন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া ক্ষীরোদা আপনার স্বামীগৃহে গেল না, সেখানে তাহার স্থান কখনো ছিল না, এখন ত নাইই। সে জাতিভ্রষ্টা, তাহার পিতৃগৃহেও তাহার স্থান নাই। যে অর্জুন নীচজাতি হইয়াও তাহার কাছে প্রণয়ের স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়া তাহাকে দেবীর আসনে বসাইয়াছিল, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া সেই অর্জুনের গৃহই তাহার রমণীয় বরণীয় ও একমাত্র আশ্রয় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে অনেক সন্ধান করিয়া অর্জুনের গ্রামে গিয়া দেখিল, অর্জুন আপন গৃহস্থালীর মধ্যে স্ত্রীপুত্রকন্যা-সমাবৃত হইয়া নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্টচিত্তে রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া সে হতাশ হইয়া গেল। ধাঁ করিয়া আনন্দের আলো নিভিয়া গিয়া তাহার মনের ভিতরটা নিবিড় অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল। অর্জুন স্তম্ভিতা ক্ষীরোদাকে দেখিয়া বলিল "এস ক্ষীরো এস, তুমি আমার বাড়ীতেই এঁস।"

ক্ষীরোদা এই স্নেহ-সম্ভাষণে কাঁদিয়া ফেলিল। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "না গো না, আমি সতীন সহিতে

পারি নাই বলিয়া স্বামীকে একেবারে হারাইয়াছি; আমাকে তুমি বিশ্বাস করিয়ো না, আমার কোথাও স্থান নাই। তোমরা সুখে আছ, সুখে থাক।" বলিতে বলিতে ঝড়ের মতো ছুটিয়া কীরোদা কোথায় চলিয়া গেল, অর্জুনে আর তাহার সন্ধান পাইল না।

পোস্টকার্ড

ইন্দুলেখা-মাসিকপত্রিকার সম্পাদক মনমোহনের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছিল। লোকটিকে আমার বড় ভালো লাগে; বিনয়ী অমায়িক অনাড়ম্বর নিরীহ লোকটি, তপস্বীর মতো সর্ব্বদা লেখাপড়ার মধ্যে যেন নিমজ্জিত হইয়া থাকে; একান্ত নিষ্ঠার জোরে সামান্য আরম্ভ হইতে ইন্দুলেখাকে আজ একখানি শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র করিয়া তুলিয়াছে; মনমোহনের গল্প উপন্যাস পড়িবার জন্য ঘরে-ঘরে বহু নরনারী প্রতিমাসের ইন্দুলেখার প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। আমি মাঝে-মাঝে তাহার বাড়ীতে গিয়া তাহার সহিত সাহিত্য-আলোচনা করিতাম; কিছু-না-কিছু নূতন শিখিয়া বাড়ী ফিরিতাম।

সেদিন মনমোহনের বাড়ীতে বেঁড়াইতে গিয়াছিলাম। মনমোহন বিবাহ করে নাই, বাড়ীতে অন্য কোনো স্ত্রীলোক আত্মীয়ও থাকে না, কাজেই আমি অসঙ্কোচে

বরাবর তার খাস কামরাতেই চলিয়া যাইতাম। মনমোহনের টেবিলের অপর দিকে বসিয়াই সেদিন আমার নজরে পড়িল একখানি অতি সুন্দর সোনা-রূপার মিশালী কাজকরা হাতীর দাঁতের ফটোফ্রেম। এমন বহুমূল্যবান্ সুন্দর ফটোফ্রেমে মনমোহন কাহার ফটোগ্রাফ রাখিয়াছে জানিতে অত্যন্ত কৌতূহল হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম —ও কার ফটোগ্রাফ?

মনমোহন লজ্জিত হইয়া বলিল—ফটোগ্রাফ নয়।

—তবে কি?

মনমোহন অধিকতর কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—ও বিশেষ কিছু নয় ও আমার একটা পাগলামি।

আমি উঠিয়া হাত বাড়াইয়া ফ্রেমখানিকে ঘুরাইয়া আমার দিকে মুখ করিয়া বসাইয়া দিলাম। দেখিলাম— ফ্রেমে ফটোগ্রাফ নয়, রঙে-আঁকা চিত্র নয়, আছে একখানি ডাকে-আসা পোষ্টকার্ড! আমি কৌতূহলী হইয়া পড়িলাম —পোষ্টকার্ডখানিতে প্রেমের কথা নাই, কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা নাই; আছে অপরিচিতকে সম্বোধন করিয়া দুটি মাত্র কাজের কথা! পোষ্টকার্ডখানিতে লেখা আছে—

বজ্রাহত বনস্পতি

ও

শ্রীযুক্ত ইন্দুলেখা-সম্পাদক মহাশয়েষু—

সবিনয় নিবেদন,

আমি কার্ত্তিক মাসের ইন্দুলেখা পাইয়াছি। কিন্তু তাহাতে ১০৪ পৃষ্ঠার পরই ১১৩ পৃষ্ঠা রহিয়াছে, মাঝের কয় পৃষ্ঠা নাই; এবং শেষের দিকে ১২৮ হইতে ১৩৬ পৃষ্ঠা দুবার আছে। ইহাতে "সোনার কাঠি" গল্পটি অসম্পূর্ণ হইয়াছে। যে কয়েক পৃষ্ঠা নাই সেই কয়েক পৃষ্ঠা অনুগ্রহ করিয়া সত্বর পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব। ইতি—

নিবেদিকা শ্রীইন্দুলেখা সেন।

কেয়ার অব বাবু তারকেশ্বর সেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।

ভগবানপুর।

গ্রাহক-নম্বর ৪৭৬৫।

আমি হাসিয়া বলিলাম—এত গ্রাহক গ্রাহিকা থাকতে এই চার-হাজার সাত-শ পঁয়ষট্টি নম্বরের বিশেষ গ্রাহিকাটির ওপর তোমার এমন পক্ষপাত কেন আমায় বলতে হবে।

মনোমোহন লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিল—ও কিছু

নয়, আমার একটা খেয়াল মাত্র। এর মধ্যে যতটা রোমান্স আছে ভাবছ তার কিছুই নেই।

আমি নাছোড় হইয়া ধরিয়া বসিলাম—এ রহস্য প্রকাশ করে' বলতেই হবে? ইন্দুলেখা তোমার কে?

মনোমোহন গম্ভীর বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া মনোমোহন তাহার জীবনের করুণ কাহিনী বলিতে লাগিল—

ইন্দুলেখা আমার কে? ইন্দুলেখা আমার কেউ না। ইন্দুলেখা আমার সব। প্রথম যৌবনে যখন আমি নির্বান্ধব একলা হইয়া পড়িয়াছিলাম তখন এই ইন্দুলেখাকে দেখিয়া বড় আপনার বলিয়া মনে হইয়াছিল।

ইন্দুলেখাকে যেদিন আমি প্রথম দেখি সেদিনকার স্মৃতিটি বড় সুন্দর। বৈশাখ মাসের বিকেল বেলা; বাগানের গাছে পথে তখনি জল দিয়া গিয়াছে; জল-পাওয়া তাজা ফুলের, আর ভিজা মাটির গন্ধে বাতাসটি সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই বাগানের কেয়ারির মধ্যে দাঁড়াইয়া একটি কিশোরী মেয়ে ফুল তুলিতেছিল। সে ফুলেরই মতো সুন্দর, চতুর্দশ বসন্তের একগাছি মালার মতো। সেই

অচেনা জায়গায় অচেনা মেয়েটি আমায় দেখিয়া চির-পরিচিতের ন্যায় যে স্নিগ্ধ হাসিটি হাসিল তাহা আমার মর্মে আজও বিদ্ধ হইয়া আছে।

তাহার সহিত আলাপ হইতে বিলম্ব হইল না তাহাদের বাড়ী আমার দিদির বাড়ীর ঠিক লাগোয়া; তাহাদের সকলের সঙ্গে দিদির খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। আমি তখন দিদির বাড়ীতে থাকিয়া পড়িব বলিয়া বাঁকিপুরে গিয়াছিলাম।

আমার মা অল্প বয়সেই মারা যান। তারপর এণ্ট্রান্স পরীক্ষার আগেই বাবাও মারা গেলেন, কিন্তু আমার খাওয়া পরা বা লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিবার মতো কোনো কিছুই সম্পত্তি রাখিয়া গেলেন না। আমি এণ্ট্রান্স পাশ করিলে দিদি আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমার ভগ্নীপতি বাঁকিপুরে ওকালতি করিতেন। আর ইন্দুলেখার পিতা পতিতপাবন বাবু ছিলেন সেখানকার সবজজ।

ইন্দুলেখাদের বাগানের ধারেই একটি ঘরে আমার বাস নির্দিষ্ট হইয়াছিল। পড়িতে পড়িতে হঠাৎ একটা গোলাপ

ফুলের মার খাইয়া চমকিয়া জানালার দিকে চাহিয়া, দেখিতে পাইতাম দুই হাতে দুই গরাদে ধরিয়া ইন্দুলেখা খিলখিল করিয়া হাসিয়া লুটিলুটি হইতেছে। কোনো দিন একরাশ যুঁইফুল ইন্দুলেখার হাসির মতো ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া আমার বইয়ের লেখা ঢাকিয়া আমার পড়া বন্ধ করিয়া দিত। কখনো সে চুপিচুপি আসিয়া পিছন হইতে চোখ টিপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত হাসি চাপিতে গিয়া খুকখুক শব্দ করিত; আমি বলিতাম—"এই জানকিয়াকি মাঈ; আঁখি ছোড়ি দে গে!"—অমনি সে হাত ছাড়িয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া কেবলি বলিত—"কেমন ঠকিয়েছি! কেমন ঠকিয়েছি! ওমা, আমি কিনা জানকিয়া-কি মাঈ!" এমনি একই ভুল আমি রোজই করিতাম, কিন্তু তাহাতেও তাহার হাসির কমতি কোনো দিনই হইত না।

আমার সহিত ইন্দুলেখার ভাব বেশি করিয়া জমিয়া উঠিল তাহার চুরি করিয়া বাংলা মাসিকপত্র আর উপন্যাস পড়িবার নেশায়। তাহার কৃপণ সবজজ বাপ মাসিকপত্র প্রভৃতি লইয়া বাজেখরচ করিতেন না; প্রকাশ্যে উপন্যাস

পড়া চোদ্দ বৎসরের মেয়ের মানাইত না; এজন্য তাহার চুরির রশদ যোগাইতে হইত আমাকে।

এমনি আনন্দে কয়েক বৎসর গেল।

আমি তখন বি-এ পড়িতেছি। শুনিলাম ইন্দুলেখার বিবাহের কথা হইতেছে। আমার মনে কেমন একটা ধাক্কা লাগিল, ভাবিতে লাগিলাম—ইন্দুলেখার বিবাহ, এত সত্বর! কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলাম ইন্দুর বয়স তখন ষোল পার হইতে চলিয়াছে। প্রবাসী বাঙালী বলিয়া ইহার আগেই তাহার বিবাহ হইয়া চুকিয়া যায় নাই। যতই ইন্দুর বিবাহের কথা চারিদিকে শুনিতে লাগিলাম, ততই যেন আমার মনের কোথায় হাহাকার জমিয়া উঠিতে লাগিল।

এখন আর ইন্দু আমার উপর পুষ্পবৃষ্টি করে না, এখন আর সে চোখ টিপিয়া ধরিয়া হাসিয়া কুটিকুটি হয় না। সেদিনকার সেই এতটুকু ইন্দু আজ বিবাহের সম্ভাবনায় গম্ভীর ভারিকি হইয়া উঠিয়াছে।

একদিন আমি ইন্দুকে হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইন্দু, বিয়ের কোথাও কিছু ঠিক হল?

ইন্দু ছলছল চোখে ভর্ৎসনা ভরিয়া একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। আমি লজ্জিত ব্যথিত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পর আর কোনো দিন ইন্দুলেখার কাছে তাহার বিবাহের কথার উল্লেখ করিতে পারি নাই।

বিবাহ হইবে ইন্দুলেখার, কিন্তু আমার দিনের কাজ আর রাতের বিশ্রাম বন্ধ হইয়া আসিল। আমি আর ইন্দুর সহিত সহজ ভাবে দেখা করিতে পারি না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার সহপাঠী বন্ধু অনাদির শরণ লইলাম।

অনাদি পতিতপাবন বাবুর সঙ্গে এ-কথা সে-কথার পর জিজ্ঞাসা করিল—ইন্দুর বিয়ের কোথাও কিছু কি ঠিক হল?

পতিতপাবন বাবু বলিলেন—না হে, কিছু ত এখনো ঠিক করতে পারিনি। তোমাদের সন্ধানে ভালো পাত্র টাত্র আছে?

অনাদি বলিল—আমাদের মনমোহনের সঙ্গে বিয়ে দিন না।

পতিতপাবন বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন—কে, খোনা? তরীপতির গলগ্রহ যে, তার সঙ্গে ইন্দুর বিয়ে দেবো? তার চেয়ে মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিলেই হয়!

তারপর পতিতপাবন বাবু যেরূপ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া উঠিলেন তাহাতে এ প্রস্তাবের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে কাহারো কিছু সন্দেহ রহিল না।

তথাপি অনাদি বলিল—কেন, মনমোহন ত ছেলে মন্দ নয়। স্বভাবচরিত্র ভালো, খুব বুদ্ধিমান, বি-এ পাশ করে চাইকি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হতে পারে; ওকালতী পাশ করলেও তরীপতির আর আপনার সাহায্যে শিগ্‌গির পসার করতেও পারবে।

পতিতপাবন বাবু বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া বলিলেন—গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল না দিয়ে বরং একজন তৈরি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কি পসারওলা উকিলের সন্ধান বলতে পার ত বল। আর খোনাকে বলে দিয়ো, সে এই-সব আকাশকুসুম ছেড়ে দিয়ে এখন লেখাপড়া করুক।

ইহার পর আর কথা চলিল না। কিন্তু কথাটা লইয়া

উভয় পরিবারে আলোচনা হইল বিস্তর। আমি ত লজ্জায় আধমরা হইয়া উঠিলাম। ইন্দুর সঙ্গে দেখা করাও দায় হইয়া উঠিল। আমি যে তাহাকে ভালোবাসি তাহা কোনো দিন মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই। এই ব্যর্থ প্রস্তাবে তাহা ব্যক্ত হইতে গেল কেন?

একদিন একটি নবীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাহু সাজিয়া ইন্দুলেখাকে গ্রাস করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মাথায় টিকি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে মাদুলি, তর্জনীতে অষ্টধাতুর আংটি; দেখিয়া বুঝিলাম হাঁ, ডেপুটি বাবুটি নিষ্ঠাবান বটে।

বিবাহের দিন সন্ধ্যাবেলা আমি পতিতপাবন বাবুর বাড়ী গিয়া বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা ও ভোজের আয়োজনে সাহায্য করিতেছিলাম। পতিতপাবন বাবু বলিলেন—মন্টু, আমার শোবার ঘর থেকে কার্পেটখানা এনে বিয়ের জায়গাটায় পেতে রাখলে ত।

আমি এক ছুটে গিয়া পতিতপাবন বাবুর শোবার ঘরে ঢুকিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলাম। ইন্দু কমলরঙের একখানি চেলী পরিয়া চণ্ডীর পুঁথি কোলে করিয়া আলপনা-দেওয়া

পাঁড়ির উপর একলাটি চুপ করিয়া বিবাহের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে ; তাহার সামনে দুটি শামাদানে দুটি বাতির সোনালি আলো কনে-চন্দন-আঁকা ইন্দুলেখার মুখের উপর পড়িয়া তাহাকে একটি দিব্য শ্রী দান করিয়াছে।

ইন্দু একবার মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিল। দেখিতে দেখিতে তাহার কপোলের পত্রলেখা ধুইয়া অশ্রুধার গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

তারপর আমি কি করিয়াছিলাম মনে নাই। অনাদি আসিয়া আমাকে ঠেলা দিয়া ডাকিল—মন্থু, মন্থু, তোকে পতিতপাবন বাবু খুঁজছেন, চ।

আমার হুঁস হইল। দেখিলাম, কখন আমি আমার ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছি। আমি কণ্ঠে অশ্রুর উচ্ছ্বাস রোধ করিয়া বলিলাম—বলগে আমার জ্বর হয়েছে, আমি যেতে পারব না।

অনাদি নীরবে তাহার হস্তের স্নেহস্পর্শ আমার কপালে বুলাইয়া দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

পর দিন বরকনে বিদায় হইবে। আমি ইন্দুর সামনে হয় ত আত্মসম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিব না, তাই আমি

তাহাদের বাড়ীতে গেলাম না। আমার ঘরের বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিলাম; যখন আমারই ঘরের সম্মুখ দিয়া ইন্দুর গাড়ী যাইবে, তখন তাহাকে শেষ দেখা একবার দেখিয়া লইব; তারপর আমার গোপন দুর্গে শীঘ্র আশ্রয় লইতে পারিব!

কিছুক্ষণ পরে ছাদে নূতন বাক্স বহন করিয়া বরকনেকে লইয়া গাড়ী পতিতপাবন বাবুর বাড়ীর ফটক হইতে বাহির হইল। গাড়ীর দরজা জানলা নিশ্ছিদ্র রকমে বন্ধ যেন পুলিশ-আদালত হইতে কয়েদীর গাড়ী জেলখানায় চলিয়াছে—যে ভিতরে আছে তাহার সমস্ত আলোক আনন্দ, আশা ভালোবাসা বাহিরে ফেলিয়া সে দুঃখের অন্ধকারে বন্দী হইয়া চলিয়াছে! আমার চোখের সামনে দিয়া ইন্দুলেখা অস্ত গেল, আমি কিন্তু তাহাকে একটিবার দেখিতেও পাইলাম না।

কিছুদিন পরে আর না থাকিতে পারিয়া ইন্দুকে একখানি চিঠি লিখিলাম। যাহাকে মুখে কোনোদিন প্রণয়-নিবেদন করিতে পারি নাই তাহাকে চিঠিতেও তাহা পারিলাম না, লিখিলাম শুধু একটি কুশলপ্রশ্ন, তাহাকে

অনুভব করিবার মতো শুধু তাহার একছত্র হাতের লেখা পাইবার প্রত্যাশায়। অনেক দিন বৃথাই গেল, ইন্দুর চিঠি আসিল না। একদিন পতিতপাবন বাবু আমায় ডাকিয়া আমার হাতে একখানি চিঠি দিয়া বলিলেন—"পড়"। আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে-ভয়ে খাম হইতে চিঠি বাহির করিতেই দেখিলাম, আমি ইন্দুকে যে একছত্রের চিঠিখানি লিখিয়াছিলাম সেইখানির সঙ্গে আর একখানি চিঠি রহিয়াছে। আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। আমার হাত হইতে চিঠি খসিয়া পড়িয়া গেল। পতিতপাবন বাবু আবার বলিলেন—"পড়"। মন্ত্রচালিতের ন্যায় চিঠি কুড়াইয়া লইয়া পড়িলাম, ইন্দুলেখার স্বামী লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু—

কে একজন মনমোহন আমার স্ত্রীকে পত্র লিখিয়াছে। আমার স্ত্রীকে জেরা করিয়া জানিলাম মনমোহন আপনাদের প্রতিবেশী, বয়সে যুবক। আমি ঈর্ষা করি না যে কোনো পরপুরুষ আমার স্ত্রীকে পত্র লেখে। উক্ত ব্যক্তিকে ডাকাইয়া আপনি একথা সমঝাইয়া দিবেন। বাবুদিগের

এরূপ করিলে আমি তাহাকে ফৌজদারী সোপর্দ করিতে বাধ্য হইব। ইতি—

প্রণত শ্রীতারকেশ্বর সেন।

পত্র পড়িয়া বুঝিলাম ইন্দুলেখার স্বামী হাকিম বটে। আমি ফৌজদারী আসামীর মতন ভয়ে লজ্জায় অভিভূত হইয়া আস্তে আস্তে চিঠি দুখানি পতিতপাবন বাবুর সম্মুখে রাখিয়া দিয়া মাথা হেঁট করিয়া দণ্ড শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলাম। পতিতপাবন বাবু চিঠি দুখানি কুটি-কুটি করিয়া ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিলেন—মধু, এ কাজটা তোমার ভালো হয়নি। হয়ত এর জন্যে ইন্দু স্বামীর কাছে লাঞ্ছনা ভোগ করবে। এমন কাজ আর কখনো কোরো না। আমি তারককে বুঝিয়ে চিঠি লিখে দেবো।

আমি লজ্জায় মাটি হইয়া বাড়ী ফিরিলাম, এই রকম লজ্জাতেই পড়িয়া দেবী জানকী একদিন মাতা বসুন্ধরাকে বিদীর্ণ হইয়া লজ্জা ঢাকিতে ডাকিয়াছিলেন। আমার কানে কেবলই বাজিতে লাগিল "হয়ত এর জন্যে ইন্দু স্বামীর কাছে লাঞ্ছনা ভোগ করিবে।" হায় হায় আমার কেন এমন দুর্বুদ্ধি হইয়াছিল।

সে আজ এগার বৎসরের কথা! তারপর আমি বি-এ এম-এ পাশ করিয়াছি। পতিতপাবন বাবু বাঁকিপুর হইতে কটকে বদলি হইয়া গিয়াছেন। আমার স্ত্রীপতির জেদ সত্ত্বেও আমি ওকালতী করার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া আট বৎসর হইল এই ইন্দুলেখা কাগজখানি চালাইতেছি। রাজা রামচন্দ্র স্বর্ণ-সীতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, দরিদ্র আমি আমার পৈতৃক ভিটামাটি বিক্রয় করিয়া এই কাগজের ইন্দুলেখা প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমার সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি অর্থ ইহারই সেবায় নিবেদন করিয়া দিয়াছি। ইন্দু-লেখা যে মাসিকপত্র পড়িতে বড় ভালোবাসিত! তাহাকে পত্র লেখার পথ যখন বন্ধ হইয়া গেল, তখন ভাবিতে ভাবিতে এই খেয়াল মাথায় আসিল—তাহারই নামে এক-খানি কাগজ প্রতিষ্ঠা করিব; তাহার বুকে আমার মর্ম-কাহিনী লিখিয়া লিখিয়া দিকে দিকে প্রেরণ করিব, যদি দৈবাৎ কোনোটা কোনোদিন ইন্দুলেখার চোখে পড়িয়া যায়। সেদিন হইতে আমার সমস্ত সাধনা হইল তাহাকেই ঘিরিয়া নব নব বিচিত্র দুঃখবেদনার গল্পজাল বয়ন করা! ভক্ত পূজারীর মতো দেবতার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নৈবেদ্য নিবেদন

করিয়া যাইতাম, জানিতাম না আমার পূজায় দেবতার আসন টলিতেছে কিনা। কায়মন-পরিশ্রমে শুধু চেষ্টা কেমন করিয়া এই ইন্দুলেখাকে এমন সুন্দর শোভন উৎকৃষ্ট করিয়া তুলিব যে ইহা ঘরে-ঘরে পঠিত হইবে। এমনি করিয়া একদিন না একদিন আমার পূজার অর্ঘ্য দেবতার চরণে পড়িলেও পড়িতে পারে কেবলমাত্র এইক্ষীণ আশায়!

মাঝে মাঝে এক এক সময় মন বড় দমিয়া যাইত, কর্মে নিরুৎসাহ জন্মিত, কোথাও কিছু এতটুকু আশ্রয় খুঁজিয়া পাইতাম না। ইন্দুলেখা আমার প্রতিবেশিনী ছিল; আমাদের বয়সও ছিল অল্প; আমি তাহার কোনই স্মরণ-চিহ্ন সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারি নাই, রাখা আবশ্যকও মনে হয় নাই। এখন কিন্তু তাহারই অভাবে আমার জীবন শূন্য বোধ হইতেছে—এক ছত্র হাতের লেখাও যদি আমার কাছে থাকিত।

একদিন দিদিকে বলিলাম—দিদি, ইন্দুদের কোনো চিঠিপত্র পাও।

দিদি বলিলেন—না কে কোথায় আছে তাই জানিনে কিন্তু আমি ত জানি, ইন্দু কোথায় আছে। কি

হওয়ায় কলিকাতা-গেজেট পড়িয়া ইন্দুলেখার স্বামীর বদলি হওয়ার খবরটা যে জানিয়া রাখা আমার কর্তব্যের মধ্যে। আমি ইতস্তত করিয়া বলিলাম—ইন্দুর স্বামী এখন ভগবানপুরে আছে। তাকে একখানা চিঠি লিখো না।

দিদি নাক সিঁটকাইয়া বলিলেন—ওরা কেউ খোঁজ খবর নেয় না, আমি আর গায়ে পড়ে' লিখিতে পারিনে। কি গরজ?

আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না। ওরা খোঁজ না লউক, আমার যে ইন্দুর খোঁজ লওয়া একান্ত গরজ তাহা আমি দিদিকে কেমন করিয়া বুঝাইব? মনের মধ্যে নিরাশার হাহাকার পুষিয়া আমাকে সন্তুষ্ট থাকিতেই হইবে। আমার এ দুঃখ কাহাকেও বুঝাইবার নয়।

একদিন হঠাৎ এই চিঠিখানি আমার ম্যানেজার আনিয়া আমাকে দেখাইয়া দপ্তরীর নামে নালিশ করিল; এবং আমার কাছে যে ফাইলের ফর্দা আছে তাহা চাহিল,—সেই ফর্দা পাঠাইয়া ইন্দুলেখার অসম্পূর্ণতা পূরণ করিয়া দিবে।

আমি চিঠিখানি হাতে করিয়া একমুহূর্ত কথা কহিতে পারিলাম না। এই ইন্দুলেখার হাতের লেখা। সে আমার কাগজের গ্রাহিকা! কবে সে একদিন আমার অজ্ঞাতসারে এমনি একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়া তাহারই-নামে-নাম-রাখা আমার কাগজের গ্রাহক হইয়াছে; সেই দুর্লভ চিঠি আমার চোখে পড়ে নাই; তাহার কদর না বুঝিয়া ম্যানেজার হয়ত তাহার বুক ফুঁড়িয়া ফাইল করিয়াছে, নয়ত ছিঁড়িয়া আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলিয়া দিয়াছে! আজ ভাগ্যক্রমে তাহার আর-একখানি পোষ্টকার্ড আমার হাতে আসিয়া পড়িল। আজ আমার সমস্ত সাধনা সার্থক হইয়াছে। আজ আমার পূজায় তুষ্ট দেবতার বর পাইয়াছি। দপ্তরীকে তাহার ভুলের জন্য আমার সর্বস্ব বকশিশ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল। আমি আপনাকে একটু সম্বরণ করিয়া লইয়া ম্যানেজারকে বলিলাম—ফর্মা পাঠাবার দরকার নেই; একখানি খুব ভালো বেধে ইন্দুলেখা মোড়ক বেঁধে আমার কাছে পাঠিয়ে দিনগে; আমি ঠিকানা লিখে দেবো।

সেইদিন হইতে ৪৭৮৫ নম্বরের গ্রাহিকার নামের লেবেলখানি আমি নিজের হাতে লিখিয়া দিই। আর

সেই অপরিচিতের মতন লেখা কাজের চিঠিখানিকেই আমার সমস্ত হাসিকান্না দিয়া ঘিরিয়া আমার চোখের সামনে রাখিয়া দিয়াছি।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী

আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। আমার সুখদুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমার প্রাণ রমণীপ্রেমে সরস নয় বলিতেছ? তবে আমার জীবনের একটি কাহিনী শুন, বুঝিতে পারিবে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর প্রাণও অতি কোমল, রমণীর সর্ব্বগ্রাসী প্রেমের প্লাবনে পরিপ্লুত; সাধারণ মনুষ্যের ন্যায়ই সুখদুঃখের আলো ও ছায়ার ক্রীড়াক্ষেত্র।

আমি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া শ্বেতাম্বরাচার্য্যের আশ্রমে পালিত হইয়াছিলাম। আশ্রম-পালিত বলিয়া শৈশব হইতেই জ্ঞানপিপাসু হইয়াছিলাম। চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়ঃকাল পর্য্যন্ত আমি নানা বিদ্যা অধিগত করিতে এত দূর ব্যস্ত ছিলাম যে, সাংসারিক জ্ঞান আমার মোটেই স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে নাই। পুলস্ত্যপুরীর উপকণ্ঠে আচার্য্যের আশ্রম; নিদ্রিত শিশুর শিয়রে জাগ্রত জননীর মতো বিদ্ধ্যগিরির হৃদয় নিঃসৃত তমসানদীর স্নেহধারা

আশ্রমটিকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছিল। আশ্রমে কত ফুল ফুটিত, কত পাখী ডাকিত, কত হরিণশিশু, কত গোবৎস, উদ্দাম আহ্লাদে ক্রীড়া করিত। আমার কিন্তু এসব দিকে লক্ষ্য ছিল না। "অজরামরবৎ" বিদ্যা অর্জ্জন করিবার উপদেশ পাইলেও আমার ক্ষুধার্ত্ত প্রাণ—জীবনের স্থায়িত্ব ভাবিয়া—শঙ্কিত হইয়া উঠিত; মুখের গ্রাস পাছে ভ্রষ্ট হয়, এই ভয়ে সে সর্ব্ববিধ জ্ঞান একেবারে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এজন্য আশ্রমের সৌন্দর্য্য, পুলস্ত্যপুরীর ঐশ্বর্য্যে আমার লক্ষ্য ছিল না। আমার চিত্ত বেদ ও সায়ণের ভাষ্যে, মহাভারত ও নীলকণ্ঠের টীকায়, বেদান্ত ও শঙ্কর-রামানুজে, কাব্য ও ব্যাকরণে একান্ত নিরাশ্রয়ভাবে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। বিপুল অরণ্যের শতপথের কোন্‌টি আশ্রয় করিলে বাহিরে যাইতে পারিব, বিশাল জলধির কোন্ দিকে গা ভাসাইলে শীঘ্র কূল পাইব, এই চিন্তাতেই আমার চিত্ত একান্ত ব্যাকুল হইয়াছিল। অনধ্যায়ের দিন আমার সহপাঠীগণ নগর ভ্রমণে যাইতেন, আমি তমসার তীরে উপল-আসনে বসিয়া আমার অধীত বিদ্যার আলোচনা করিতাম। চিন্তায়

চিন্তায় রাজি হইয়া যাইত; আচার্য্যের আদেশ-প্রেরিত বিরক্ত সহাধ্যায়ীগণ বহু সন্ধানে আমাকে বিদ্রূপ উপহাসে আহ্বান করিয়া আশ্রমে ফিরিত; পথে তাহাদের নগর-ভ্রমণ-কাহিনী শুনিতাম, কিছু বুঝিতে পারিতাম না। আমি আমার নির্জ্জন গ্রাম ও আচার্য্যের আশ্রম ভিন্ন অন্ত কোনো স্থান দেখি নাই।

কাব্যেতিহাসে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কত কি পড়িতাম; তাহাদের অস্পষ্ট পরিচয় আমার মনের এক কোণে পড়িয়া ছিল। কোনো স্ত্রীলোকের সহিত আমার সম্বন্ধ না থাকাতে, তাহাদের বিষয় আমার চিন্তাতেও আসিত না।

যখন আমার বয়স চতুর্বিংশতি বর্ষ অতিক্রম করিল, তখন একদিন আচার্য্য আমাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বৎস ইন্দ্রভূতি, তোমার শিক্ষাকাল পূর্ণ হইয়াছে; এক্ষণে তোমাকে দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে, বিবাহ করিয়া সংসার আশ্রম অবলম্বন করিতে হইবে; তুমি তজ্জন্য প্রস্তুত হও।"

আচার্য্য আমাকে চিনিতেন, তাই এত করিয়া বার বার আমাকে দ্বিতীয়াশ্রম ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন। কে-

সকল ছাত্রের আমার মতো ব্রহ্মচর্যত্যাগের সময় আসিয়াছে, তাহারা তাহাদের আসন্নমুক্তি স্মরণ করিয়া আমার দিকে স্মিতমুখে চাহিয়া আমার প্রসন্ন ভাগ্যকে অভিনন্দন করিল; যাহাদের এখনো বিলম্ব আছে, তাহারা আমার দিকে ঈর্ষা-ব্যাকুলচক্ষে তাকাইল; কিন্তু আমার পক্ষে আচার্য্যের আদেশ বজ্রাঘাত-তুল্য বোধ হইল। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি যেমন নিমেষমধ্যে আপনার অবস্থা, অতীত-ভবিষ্যতের সুখ দুঃখ, ধরণীর শোভা সম্পৎ, স্মরণ করিয়া লয়, ও পর মুহূর্ত্তে বধমঞ্চ ও ঘাতককে দেখিয়া শিহরিয়া উঠে, আমিও তেমনি আচার্য্যের আদেশ শ্রবণ করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। আমার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। আমি আচার্য্যের পদযুগল অশ্রুধৌত করিয়া কহিলাম, 'প্রভু, আপনি এ নিদারুণ আজ্ঞা করিবেন না; আমার আত্মার ক্ষুধা আজিও মিটে নাই; হে দেব, আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন।'

আচার্য্য সস্নেহে আমাকে পদতল হইতে উত্তোলন করিয়া নিজের ক্রোড়ের মধ্যে টানিয়া লইলেন, এবং আমার সর্ব্বাঙ্গে হস্তামর্ষণ করিতে লাগিলেন, কোনো কথা

কহিলেন না। বুঝিলাম প্রশান্ত জলধিতে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। ক্ষণেক পরে গদগদ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, 'বৎস, তোমার জ্ঞানপিপাসা অদ্ভুত, অসাধারণ। কিন্তু এরূপ জ্ঞান অসম্পূর্ণ, একদেশী। জ্ঞানভাণ্ডারের চাবী তোমার আয়ত্ত হইয়াছে; সংসারাশ্রম অবলম্বন করিয়া তুমি জ্ঞানচর্চ্চা করিলে তোমার জ্ঞান সর্ব্বতোমুখী হইবে; তোমার চিত্তের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতিলাভ ঘটিবে। অতএব বৎস, আমার উপদেশ শুন, তুমি দ্বিতীয়াশ্রমে প্রবেশ কর।'

আমি পূর্ব্ববৎ কাতরভাবে বলিলাম, 'প্রভু, আমি আপনার অনুজ্ঞাত বিষয় কোনো দিনও চিন্তা করিয়া দেখি নাই। পাঠপ্রসঙ্গে যদি বা কখনো চিন্তায় আবশ্যক হইয়াছে, আমি এই আশ্রম বহির্ভূত জীবন কল্পনা করিতে পারি নাই। আমি সংসার জানি না; লোক-চরিত্র চিনি না; আমাকে অসহায় অবস্থায় জটিল অরণ্যে নিক্ষেপ করিবেন না।'

গুরুদেব আমার চিন্তিত হইলেন। সদাপ্রফুল্ল গৌর মুখশ্রী দীপ্ত লোহিতাভা ধারণ করিল; প্রশান্ত নয়নদ্বয়

স্নেহ-সিক্ত হইয়া উঠিল ; দীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু বাহিয়া দুটি বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া আমার মস্তকে আশীর্বাদ বর্ষণ করিল ;. আচার্য্য আমার মস্তক চুম্বন করিলেন। তৎপরে গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'আগামী পৌর্ণমাসীতে তোমাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত করিব ; বৎস, তুমি ইহার মধ্যে আমার পূর্ব্ব আদেশ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিয়ো। যে পথ শ্রেয়তর হইবে তাহাই আশ্রয়নীয়।"

* * *

আজ আমার চিরবাঞ্ছিত পৌর্ণমাসী। আজ আমার দীক্ষার দিন। ক্ষুদ্র আশ্রমটিতে আজ বড় সমারোহ ; সতীর্থগণ অতি প্রত্যূষ হইতে আশ্রমটিকে পুষ্পপত্রবল্লী-শোভিত করিয়া তুলিয়াছেন। সমিধ পুষ্পচন্দন আহৃত হইতেছে, গোদোহন ও দধিমন্থনধ্বনি উত্থিত হইতেছে। বেদ গায়ত্রী গান করিয়া সতীর্থ সঙ্গে স্নান করিয়া আসিলাম। হোমগন্ধে শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। এত আনন্দ কোনো যুবক বিবাহ-বাসরে পাইয়াছে কি না সন্দেহ।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করার সংবাদ নগরে প্রচারিত হইয়াছিল। বহু নাগরিক সমবেত হইয়াছে; আর আসিয়াছেন সপারিষদ্ রাজা বিজয়মিত্র। আমার সতীর্থ-গণ অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত ছিলেন। আমার এসকল বিষয়ে কোনো লক্ষ্য ছিল না।

আমার দীক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইল। যথাবিধি হোমাদি সম্পন্ন করিয়া আচার্য্য মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আমার হস্তে দণ্ড-কমণ্ডলু দিবেন, এমন সময় আমার চক্ষু এক অপার্থিব মূর্ত্তি দর্শন করিল। এই কি নারী? নারী এত সুন্দর?

আমার মোহ-আবরণ ঘুচিয়া গেল। জন্মান্ধের যেন নয়নলাভ হইল। আমি পৃথিবীর সহিত পরিচিত হইলাম; তাহার শোভা ও সম্পৎ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে আচার্য্য আমার চক্ষে ভাস্করের মতো দীপ্ত ও চন্দ্রের মতো সুন্দর ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার লোলচর্ম্ম শিরাবহুল দেহ আমার চক্ষে ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। এই নরকে কে তুমি দেবী স্বর্গ হইতে মূঢ় আমাকে জ্ঞান দিতে আসিয়াছ?

আমার জ্ঞানের বড় স্পর্দ্ধা ছিল, সে স্পর্দ্ধা টুটিয়া গেল।

আমি চক্ষু অবনত করিলাম, মনে করিলাম আর চোখ তুলিব না। তথাপি সেই অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তিখানি আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। বহুক্ষণ সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেও প্রতিচ্ছায় নয়নের সম্মুখে যেমন শত সূর্য্যচ্ছবি নাচিতে থাকে, আমারও সেই দশা হইল। আমার সংজ্ঞা লুপ্ত হইতে লাগিল। আমার দর্শন বিজ্ঞান যাহা বুঝাইতে পারে নাই আজ মৌন-ভাষায় তাহা বুঝাইলে; অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দ্বার মুক্ত করিয়া আমায় নবজীবন দান করিলে; নূতনতর চিন্তায় আমার চিত্ত মধুময় করিয়া দিলে।

আমার অসহ্য কষ্ট বোধ হইতে লাগিল; প্রতি মুহূর্ত্ত আমার মৃত্যুমুহূর্ত্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আচার্য্য যখন দণ্ডকমণ্ডলু হাতে দিয়া বলিলেন 'গৃহাণ', তখন আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় বিদ্রোহী হইলেও জিহ্বা বলিল 'গৃহ্লামি'। যে সংসারের দ্বারে আমার ব্যথিত আত্মা পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতেছিল, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার ভাগ্যচক্র সেখান হইতে আমাকে দূরে বহুদূরে টানিয়া লইয়া চলিল। আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল দণ্ডকমণ্ডলু দূরে টানিয়া

ফেলিয়া দি,—হস্ত বজ্রমুষ্টিতে তাহা ধরিয়া রহিল। মনে করিলাম, হৃদয়ের সকল বলের সহিত চীৎকার করিয়া বলি, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব না;—জিহ্বা জোরে তালুকে আঁকড়িয়া রহিল, একটিও বাক্‌স্ফূর্তি হইল না। কেন এমন হইল? ভীরু যখন লোকের দেখাদেখি, নিজের ভীরুতা ঢাকা দিবার জন্যই যুদ্ধে যায়, তখন যুদ্ধাস্ত্রের দারুণ সম্ভাষণে ভীত হইয়া সে মনে করে, এই প্রাণান্তক বীরত্ব দেখানো অপেক্ষা আমার ভীরু থাকাই ভালো ছিল; কিন্তু তখন নিরুপায়; পৃষ্ঠ দেখাইলে সহস্র চক্ষুর ধিক্কার তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে। সকলের ইচ্ছায় তখন তাহার ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত; তখন প্রত্যাবর্তনের ক্ষমতা সংশুষ্ক, বিলুপ্ত।

যত আমার দীক্ষা সম্পূর্ণ হইতে লাগিল, তত সেই অপরিচিত ও চিরপরিচিত সুন্দরীর ভাবের পরিবর্তন হইতে লাগিল। তাহার সেই নম্র স্নেহদীপ্ত বদনশ্রী যেন ঘৃণায় হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল। আমি বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য আর একবার প্রাণপণ চেষ্টা করিলাম। মুখ হইতে প্রতিষেধক একটি মৃদু শব্দও বাহির হইল না।

স্বপ্নে প্রাণান্তকালেও যেমন একটিও কথা কহিতে পারা যায় না, আমার সেইরূপ অবস্থা; কেবল অবোধ্য মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিতেছিলাম, তাহার একবর্ণও আমার বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না। আমি ইসারায় আমার ইচ্ছা জানাইতে চেষ্টা করিলাম, তাহাও পারিলাম না।

সেই সুন্দরী আমার অবস্থা বুঝিতে পারিল বলিয়া মনে হইল; অই তাহার সদয় স্নিগ্ধ দৃষ্টি আমাকে আশা ও আশ্বাস দিয়া গেল। আমার বোধ হইতে লাগিল সে যেন বলিতেছে, 'হে পুরুষ, তুমি আমার হও, আমাতে এস; আমিই তোমাকে জ্ঞান দিব, নবজীবন দিব। যে মৃত্যুবন্ধনে আপনাকে বিজড়িত করিতেছ, তাহা ছিন্ন করিয়া আমার বাহুবন্ধনে চলিয়া এস; আমার বক্ষে শুধু আশা আহ্লাদ ও জীবন; আমিই সুন্দর, আমিই যৌবন, আমিই জীবন! এস, এস, হে বন্ধু, আমরা দুজনে একটী অনন্ত চুম্বনের সুখাবেশের মতো সংসারে ভাসিয়া চলিব। আমার প্রাণের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি মাগিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছে, আমার নিরালম্ব প্রেম আশ্রয় খুঁজিয়াছে; পায় নাই হে, কোথাও পায় নাই। হে সুন্দর, আজ

তোমায় পাইয়াছি; আমার মানসকল্পিত পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমার মনোমন্দির ছাড়িয়া আজ বাহিরে আসিয়াছ; এস হে ফিরে এস; আমার চিরবাঞ্ছিত তুমি, আমার এই বক্ষ-স্বর্গে ফিরে এস; তুমি তৃপ্তি পাইবে, আমি তৃপ্তি পাইব।"

তাহার করুণ দৃষ্টি হইতে যে সঙ্গীত তরঙ্গায়িত হইয়া আমার প্রাণের দ্বারে জোরে আঘাত করিতেছিল, তাহা আমি শুনিলাম, বুঝিলাম আমি ধর্ম ঈশ্বর ইহপরকাল ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলাম; কিন্তু আমার দীক্ষার সকল বিধিই পালিত হইল। সব শেষ হইয়া গেল। আমি লোকের চক্ষে এক্ষণে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী, আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী! ধন্য লোকাচার! ধন্য তোমার প্রভাব! তুমি ভীরুকে বল দাও, তুমি বীরকে ভীরু কর।

সেই সুন্দরী আবার আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিল। সে দৃষ্টিতে কি তীব্র তিরস্কার! তাহা বৃশ্চিকের হুলের মতো আমার প্রাণের উপর এক আঘাতে সহস্র বেদনা জাগাইয়া তুলিল। তখন তাহার মুখে চোখে যে হতাশ্বাস ও দুঃখ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেরূপ বুঝি আর

কাহারো হয় না। দেখিলাম যেন তাহার সকল শিরা ধমনী হইতে রক্ত সরিয়া গিয়া হৃদয়ে জড়ো হইয়াছে; তাহার অরবিন্দসুন্দর মুখখানি পাণ্ডুর; তাহার মৃণালবাহু যেন রৌদ্রতাপে শুষ্ক বিমলিন; স্থলপদ্মের মতো সুন্দর চরণ দুখানি ম্লান, স্ফূর্তিহীন, বলহীন। সে একটা পুষ্পলতাচ্ছন্ন বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। তাহার মূর্তি নিশ্চল, রক্তহীন,—যেন ভাস্করপ্রেয়সী মর্মরমূর্তি। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সেই সময়ে আচার্য্যের আদেশ হইল, 'যাও বৎস, জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানদানের জন্য জনসাধারণের সহায়তা ও সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আইস।' আমি মত্তপের মতো টলিতে টলিতে ভিক্ষায় বাহির হইলাম। কত লোক কত কি ভিক্ষা দিল; রাজা বিজয়সিংহ বহু রত্নরাজি ভিক্ষা দিলেন; আমার সে সব দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর ও ক্ষমতা ছিল না। ভিক্ষা করিতে করিতে নগরের দিকে যাইতেছি, এমন সময় আমার হস্তে কাহার হস্তস্পর্শ হইল। আহা, সে স্পর্শ কি কোমল, কি উন্মাদন, কি অভাব্য, অনির্ব্বচনীয় সুখপ্রদ! সে স্পর্শ সর্পত্বকের মতো মসৃণ ও সুখশীতল হইলেও, আমার হস্তের পৃষ্ঠ স্থান-

যেন তপ্ত লৌহে দগ্ধ হইয়া গেল। স্পর্শে আমার চেতনা হইল। মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি, আমারই আরাধ্যা দেবী আমায় ভিক্ষা দিতেছে। সে চুপিচুপি বলিল, 'হতভাগ্য যুবক, তুমি কি করিলে?' সে দূরে সরিয়া গেল। তাহার সেই কয়টি তীব্র ভং'সনাবাক্য অজস্র টীকাভাষ্য-মুখরিত নিগমান্তবিদ্যার মতো আমার নিকট কত নূতন নূতনতর কথা ব্যক্ত করিয়া গেল। তাহার অকথিত বাণী যেন বলিতে লাগিল, 'হায় মূর্খ, তুমি আজ কি ছার মণিকাঞ্চনের ভিক্ষার্থী হইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছ! অমূল্য নিধি তোমায় সাধিয়া দিতেছিলাম, তুমি তাহা লইলে না।' আমার প্রাণ শত ধিক্কারে কুণ্ঠিত হইয়া হায় হায় করিয়া উঠিল।

দেখিলাম, সেই মূর্ত সৌন্দর্য্য, মূর্ত যৌবন, মূর্ত সুখ, মূর্ত আনন্দ সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মতো একখানি রথে আরোহণ করিয়া নগরাভিমুখে ছুটিয়া গেল। সে যত দূরে যাইতে লাগিল, তত আমার অন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। হায় হায়, এই কি রমণী? ঐ কি রমণীর স্পর্শ? বুঝিলাম, রমণীই শরীরী জ্ঞান, আমি বৃথাই পুঁথির কীটদষ্ট

পত্রের অক্ষর পরম্পরায় জ্ঞান অন্বেষণ করিয়াছি। রমণী, তুমি আছ বলিয়া জগৎ আছে; তুমি সৎ, আর সমস্ত মিথ্যা; তোমার রূপৈশ্বর্য্যের প্রতি-কণিকায় জগৎ বাঁচিয়া আছে, সমস্ত তোমাতেই লয় হইতেছে। হায় হায়, এই ত বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও শঙ্করের মায়াবাদ। তুমিই ত প্রকৃত 'দর্শন'; তোমাকে জানিতে পারাই প্রকৃত 'বিজ্ঞান'। তুমি লক্ষ্মী, তুমিই সরস্বতী। হে চিত্রকর, তোমার তুলিকা-রেখায় রমণীরূপের কণামাত্রও তুমি প্রকাশ করিতে পার না। হে রমণীরূপের ব্যর্থ টীকাকার কবি, তোমার লেখনী রমণীমহিমার ক্ষীণ ছায়াও আমাদের সম্মুখে ধরিতে পারে না। আমি বুঝিলাম রমণীই শরীরিণী কবিতা। রমণী স্বয়ং 'রুচিরা' ও 'প্রহর্ষিণী', তাহার কবরীই 'পুষ্পিতাগ্রা'। তাহার চক্ষে 'শার্দ্দূলবিক্রীড়িত', ললাটে 'বসন্ততিলক', কণ্ঠমালিকায় 'মালিনী', বাহুবিভঙ্গে 'ত্রোটক' 'তূণক' প্রভৃতি ছন্দসকল খেলা করে; 'ইন্দ্রবজ্রা' ও 'উপেন্দ্রবজ্রা' তাহার বক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাহারই চরণতলে 'গজগতি' ও 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দ বাঁধা রহিয়াছে। তাহার বিরহে আমার অন্তরে 'বিয়োগিনী' ছন্দ ধ্বনিত হইয়া

উঠিল, তাহার রথচক্রের ধূলিতে 'রথোদ্ধতা' ছন্দ নৃত্য করিতে লাগিল। সে কী সুন্দর! কী মহান্! জ্যোৎস্না-লোকের মতো অতীন্দ্রিয় রূপ, বাসন্তী শোভার মতো সজীব চক্ষুদ্বয়, ঘোর বর্ষার মেঘের মতো সুদীর্ঘ নিবিড়চিক্কণ চিকুরজাল, মুক্তাফলসদৃশ স্মিত-বিকশিত দন্তপাঁতি, তাহার গণ্ডে গোলাপফুল্লতা! সে হেমন্তের মতো কুহেলিকায় প্রচ্ছন্ন, প্রহেলিকাময়! এই নারী এমন, আগে যদি জানিতাম! ইহারই সহিত সম্বন্ধ বিবাহ? ইহার সহবাসই কি সংসারাশ্রম? হায় হায়, আমি কি করিয়াছি? হে অপরিচিতা, তুমি এমন অসময়ে আমার নিকট চির-পরিচিতার মতো আসিলে কেন?

আমার অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া উঠিল; আমি ক্ষণে আরক্ত, ক্ষণে পাণ্ডুর, ক্ষণে দৃপ্ত, ক্ষণে অবসন্ন হইতে লাগিলাম। আচার্য্য তীক্ষ্ণ রূঢ় দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আমার এক সতীর্থ কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া ভিক্ষাসংগ্রহার্থ নগরাভিমুখে লইয়া চলিল। আমার সতীর্থ জাজালি আমাকে নগরের বহুস্থানে লইয়া বেড়াইল। এই নগর? অনাস্তনত সৌধশ্রেণী,—

শ্বেত, পীত, লোহিত, নানা বর্ণের, নানা ছন্দের। কত বিপণি, কত ক্রেতা বিক্রেতা! কী বিশাল জনসঙ্ঘ! কী অবিশ্রাম কর্মস্রোত! এই নগর, এই সংসার! এতদিন আমি অন্ধের মতো কিছু দেখি নাই, কিছু বুঝি নাই। বোধ আসিল, কিন্তু এমন অসময়ে আসিল কেন? সুবিধা যদি আসে, তবে অসুবিধা সঙ্গে লইয়া আসে কেন?

আমরা ঘুরিতে ঘুরিতে রাজপ্রাসাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কী বিশাল অট্টালিকা! কী সুরম্য উদ্যান! কী বিপুল ঐশ্বর্য! কাষায়বস্ত্রপরিহিত সন্ন্যাসী আমি, আমার নিজের, আমার জ্ঞানের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিয়া নিতান্ত খিন্ন ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলাম। রাজ-প্রাসাদ ছাড়াইয়া কিছু দূর যাইয়া প্রাসাদতুল্য আর-একটি সুরম্য অট্টালিকা দেখিলাম। সতীর্থ জাজালি সে দিকে না গিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিলেন দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভ্রাতঃ, সম্মুখে ঐ অট্টালিকা কাহার? চল, ঐ দিক দিয়া যাই।' জাজালি আপনার মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, 'ভ্রাত ইন্দ্রভূতি, তুমি ঐ দিকে আর দেখিয়ো না; ঐ অট্টালিকার নাম 'পারাবতভবন', উহা

পাপনিকেতন, উহার অধিষ্ঠাত্রী রাজনর্তকী। উহা দর্শন করিয়ো না, উহাতে পাপ স্পর্শ করিবে।'

যেখানে বাধা যেখানে আবরণ, সেইখানেই আগ্রহ। আমাকে বারণ করা হইল বলিয়াই আমার চক্ষু ঔৎসুক্যভরে সেই অট্টালিকার দিকে চাহিল। তখন পথের বক্রতায় সেই অট্টালিকার প্রায় সবখানি অন্তরালে পড়িয়াছিল, কেবল একটি গবাক্ষ দেখা গেল। ঐ না আমার বাঞ্ছিতা বন্দিতা গবাক্ষলীনা! সে গবাক্ষও অদৃশ্য হইল। কিন্তু সে মূর্তি আমার দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে, ঊর্ধ্বে সর্বত্র, বিরাজিত দেখিতে লাগিলাম। অনুভব করিতে লাগিলাম, আমার হস্তে হস্ত রাখিয়া সে করুণ কঠোর স্বরে বলিতেছে 'হতভাগ্য যুবক' তুমি কি করিলে!'

অগ্রে কাঙালি, পশ্চাতে আমি, 'ভিক্ষাং দেহি' বলিতে বলিতে পথ অতিক্রম করিতেছি। যাহার যাহা ইচ্ছা আমার ঝুলিতে দিয়া যাইতেছে; আমার ঝুলি আমার মনের মতো ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি আমার চিত্ত ত ভরে না। ক্রমে নগর-উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; আশ্রমের পথে চলিলাম। রাজপথ ছাড়িয়া অন্ত

পথে যেমন ফিরিব, একটি বিবিধভূষণমণ্ডিতা রমণী সত্বর আসিয়া আমার ঝুলিতে কি দিয়াই দূরে চলিয়া গেল ও ইসারায় তাহা গোপন করিতে বলিল। কাঙালি তখন পথের বক্রতায় আমা হইতে পৃথক, সে কিছু দেখিল না।

আশ্রমে আসিয়া আমি একক হইবার অবসর খুঁজিতে লাগিলাম। সে অবসর সন্ধ্যার পূর্ব্বে জুটিল না। সান্ধ্যকৃত্য সমাপনের পর আমি একাকী আমার একখানি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র কুটীরে যাইয়া একটি প্রদীপ জ্বালিলাম। সত্বর সেই রমণীপ্রদত্ত দ্রব্য আমার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বাহির করিলাম—একটি স্বর্ণপেটিকা, বিচিত্র কারুকার্য্যময়। উহা খুলিলাম,—ভিতরে একখণ্ড ভূর্জ্জপত্রে লিখিত,—"কুবলয়া—পারাবতভবন"; পেটিকার ঢাকনীতে একটি নারী মূর্ত্তি বিবিধ বর্ণে চিত্রিত। এইত আমার বাঞ্ছিতা! আমার বন্দিতা। সে পতিতা, জগৎ-সংসারের চক্ষে, আমার চক্ষে নহে, আমার ঘৃণা আসিল না। আমি বুঝিলাম কি দারুণ প্রেম-পিপাসায় জর্জ্জরিত হইয়া আমার কুবলয়া বহু অঙ্গার ঘাঁটিয়া, নিজে মসীলিপ্ত হইয়া একখানি হীরকের মতো উজ্জ্বল নির্ম্মল মহামূল্য প্রাণ অন্বেষণ করি-

তেছে। আমি দিব গো, তোমায় তৃপ্তি দিব; আমার প্রেম দিয়া তোমার ক্ষুধা মিটাইব, তোমার কালিমা দূর করিব, প্রেমে তোমায় দেবী করিব।

চক্ষের সমক্ষে 'পারাবত-ভবন' তাহার উচ্চচূড় অলিন্দ-চত্বর সহ ভাসিয়া উঠিল, তাহারই একটি গবাক্ষলীনা আমার আরাধ্যা,—যেন আমায় বলিতেছে, 'হতভাগ্য যুবক, কি করিলে!'

নহি, নহি, আমি হতভাগ্য নহি। স্থূল দেহের মিলন প্রকৃত মিলন নহে। তোমায় আমি মনোমন্দিরে পাইয়াছি, আমার জ্ঞানচর্চ্চিত কঠোর চিত্ত প্রেমপ্লাবনে দ্রব হইয়াছে। তোমায় না পাইলে হতভাগ্য থাকিতাম। আর আমি হতভাগ্য নহি, তুমিও পতিতা নহ।

পরমুহূর্ত্তে সব অন্তর্হিত হইল। তখন আমি উন্মত্তবৎ যেখানে তাহার হস্তস্পর্শ হইয়াছিল, আমার হস্তের সেই স্থান চুম্বন করিতে করিতে লাল করিয়া তুলিলাম। "কুবলয়া, কুবলয়া" বলিয়া পেটিকাচিত্রিত মূর্ত্তিকে বক্ষে চাপিয়া ধরিতে লাগিলাম।

এই চুম্বন ? এই আলিঙ্গন ? আমায় কে শিখাইল ? তাহার চক্ষের একটি দৃষ্টিতে আমার প্রাণে অযত্ন সঞ্চিত প্রচ্ছন্ন প্রেমের প্লাবন আসিয়াছে ; আমার যৌবন একমুহূর্তে আমার দেহ মন অধিকার করিয়া বসিয়াছে ; মৃতসঞ্জীবনী একটি দৃষ্টিতে আমার নব-জীবন লাভ হইয়াছে। মন্মথ কি তাহার ইঙ্গিতানুবর্তী ? শুনিতেছি কুটীরে মশক গুঞ্জন করিয়া বলিতেছে, 'হতভাগ্য যুবক, কি করিলে' ? শৃগাল পেচক চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 'হতভাগ্য যুবক, কি করিলে ?'

আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—আমার পক্ষে রমণীর প্রেম, রমণীর সঙ্গ নিষিদ্ধ,—হায় হায়, আমার এ দশা কেন হইল ? আমার কাষায় বস্ত্র আমারই শব-আবরণী বলিয়া মনে হইতে লাগিল, আশ্রমকুটীর আমার চিতাশয্যা বলিয়া বোধ হইল। একটি ক্ষণিক দৃষ্টির বিনিময়ে এত একাগ্রতা এত প্রেম আগ্রহ কেন আমার সর্বেন্দ্রিয় অধিকার করিয়া বসিল ? নানাবিধ প্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তায় ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাবেশ আসিল !—সে নিদ্রা স্বপ্নসঙ্কুল,—স্বপ্নে সেই চুম্বনটা !

প্রাতঃকালে তমসার তীরে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম,—সেই কুবলয়া। দেখিলাম—

"মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা॥"

মল্লিনাথের টীকা যাহা আমায় বুঝাইতে পারে নাই, কুবলয়ার একটি সকরুণ দৃষ্টি আজ তাহা আমাকে বুঝাইল। হায় হায়, আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী! আর একবার মাত্র কুবলয়াকে দেখিবার ইচ্ছা হইতেছিল; কিন্তু আমি নগর চিনি না, সেখানে আমার কেহ পরিচিত নাই, আশ্রম ছাড়িয়া যাওয়ার ছলও স্থির করিতে পারিলাম না। কুবলয়া এত দুষ্প্রাপ্য তুমি! আমি নিরাশ্বাসে নিরাশ্রয়ভাবে উপলাস্তীর্ণ বন্ধুর তমসাতটে পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিলাম। ক্ষণেক পরে দেখি, জাজালি সস্নেহাকুল দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া আছেন। আমি লজ্জায় হস্ত দ্বারা বদন আবৃত করিলাম। জাজালি কহিলেন, 'ভাই ইন্দ্রভূতি,

তোমার কোনো অসামান্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আমরণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছ কি? ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা কর, ব্রহ্মণ্যদেব তোমায় বল দিবেন, ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কঠিনতম চিত্তও সময়ে সময়ে বিষম ঝঞ্ঝায় আন্দোলিত হইয়া উঠে। সাবধানতা ও চেষ্টা আত্মরক্ষার বর্ম। তুমি জ্ঞানী, তোমায় আমি অধিক কি বলিব?'

হাই জ্ঞান! সে স্পর্দ্ধা টুটিয়াছে। রমণীর একটি ক্ষীণ দৃষ্টিরেখা আমার চিত্তের জ্ঞানাঙ্কিত পৃষ্ঠা একেবারে মসীলিপ্ত করিয়া দিয়াছে। সেখানে আর কিছু নাই, শুধু কালী, শুধু অন্ধকার! না, না, ভুল বুঝিয়াছি; কুবলয়ার রূপজ্যোতিতে ঝলসিত নয়ন ক্ষণিকের জন্ম অন্ধকার দেখিতেছে; নতুবা, আছে আছে, সব আছে; নরকের মধ্যেও ভোগবতীর প্রেমপ্লাবন প্রবাহিত হইতেছে।

জাজালি কহিতে লাগিলেন, 'আচার্য্যের আদেশ, কল্য প্রত্যূষে তোমাকে তপতী-তীরস্থ "সারদাশ্রমে" যাইতে হইবে। সেই তোমার স্বাধীন জ্ঞানক্ষেত্র হইবে। তুমি প্রস্তুত থাকিবে। আমি সঙ্গে যাইয়া রাখিয়া আসিব।'

হা ভগবান, তোমার কি কঠিন বিচার! কুবলয়ার নিকট হইতে দূরে দূরে দূরান্তে আমার এই শোচনীয় জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে? সব শেষ হইয়া গেল? না, না, কুবলয়া যে এখন আমার মানসী; আমাদের বিরহ কে ঘটাইবে?

সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম। ভিক্ষালব্ধ সমস্ত দ্রব্যাদি বন্টন করিলাম। অযাচিত শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা কুবলয়ার স্বর্ণপেটিকা উত্তরীয়ে বাঁধিয়া বুকের উপরে ঝুলাইয়া লইলাম। অতি প্রত্যূষে আজালি আমার দ্বারে উপস্থিত। তাঁহার সহিত নির্গত হইলাম। আচার্য্যকে প্রণাম করিলাম। সতীর্থগণ আসিয়া আমায় আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গনকালে আমার বুকে কঠিন স্বর্ণপেটিকা সকলেই অনুভব করিলেন, আমার মুখের দিকে বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কেহ কোনো প্রশ্ন করিলেন না। আমরা বিদায় হইলাম।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমরা নগরে প্রবেশ করিলাম। নগর সুপ্তসিংহের মতো, প্রশান্ত জলধির মতো বিরাট গাম্ভীর্য্যে বড় সুন্দর। কেবল রক্ষীগণ ইতস্তত ভ্রমণ

করিতেছে। ব্রাহ্মণগণ তমসায় স্নান করিতে যাইতেছেন। এক গৃহ হইতে শিশুর অস্ফুট কাকলি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দেখিলাম, এক মাতা পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে দূরে ধরিতেছেন; শিশু, সেই চুম্বন-সুধার মুহূর্ত্তপানে তৃপ্ত না হইয়া হাত পা নাড়িয়া, অস্ফুটভাবে কত কি বলিয়া প্রাণের ব্যগ্রতা জানাইতেছে; আবার মাতা হাসিয়া, একটি চুম্বন দিয়া, তাহাকে দূরে ধরিতেছেন; পার্শ্বে শিশুর পিতা অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় মাতা পুত্রের স্নেহপিপাসা দেখিয়া হাস্য করিতেছেন, তাঁহার এক হস্ত রমণীর কটিতে প্রেমের বেষ্টনী হইয়া আছে। মনে পড়িল—

"রথাঙ্গনাম্নোরিব ভাববন্ধনং
বভূব যৎ প্রেম পরস্পরাশ্রয়ম্।
বিভক্তমপ্যেক সুতেন তৎ তয়োঃ
পরস্পরস্যোপরি পর্য্যচীয়ত।"

হিংসায় চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল।

ঐ যে আমার জন্মজন্মান্তরের চিরপরিচিত 'পারাবত-

ভবন'। একটি গবাক্ষ খুলিয়া ঐ না আমার কুবলয়া! ঊষার আলোক-আঁধারে আমায় দেখিতে পাইতেছে কি? একটি দীর্ঘনিশ্বাস গবাক্ষ হইতে তপ্তলৌহপিণ্ডের মতো আমার হৃদয়ে আসিয়া পড়িল। গবাক্ষ বন্ধ হইয়া গেল। জাঙ্গালি বলিলেন, 'পারাবত-ভবনে নৃত্য গীত আলোক উৎসব কিছু নাই। আশ্চর্য্য!' আমার মনে হইতে লাগিল, আমার সম্মুখের গবাক্ষে কুবলয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মৌনভাষায় যেন আমায় বলিতেছে 'এস, এস, আমার আদর্শসুন্দর, আমার সকল ঐশ্বর্য্য রূপ যৌবন তোমার চরণে অর্ঘ্য দিতেছি। লোকলজ্জা ত্যাগ করিয়া উঠাইয়া লও হে, উঠাইয়া লও।' ভীরু আমি যন্ত্রচালিতের মতো জাঙ্গালির সহিত চলিয়া গেলাম। আমি কুবলয়ার সুপ্ত নারীত্ব জাগ্রত করিয়া দিয়াছি, আর কুবলয়া আমার প্রাণের সুপ্ত প্রেম জাগ্রত করিয়া দিয়াছে—কিন্তু আমি সেই প্রেমের অর্ঘ্য দিয়া তাহার নারীত্বের পূজা করিতে পারিলাম না। আমার প্রেম ও তাহার নারীত্ব নিষ্ফল বিলাপে হায় হায় করিতে লাগিল।

বজ্রাহত বনস্পতি

(২)

আমার নূতন আশ্রমে আসিয়াছি। আমিই এই আশ্রমের বর্ত্তমান আচার্য্য। আমার সবল গুটিকয়েক ছাত্র।

একদিন আশ্রমসন্নিহিত উদ্যানে আমি ভ্রমণ করিতেছি, দূরে দেখিলাম একটি রমণীমূর্ত্তি। ঐ ত আমার কুবলয়া! দৌড়িয়া ধরিতে গেলাম। সে একটা বৃক্ষের পশ্চাতে গেল, তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। কেবল কোমল ঘাসের উপর তাহার পদচিহ্ন পড়িয়া আছে। আমি তাহার উপর বুক দিয়া পড়িলাম।

ক্ষণেক পরে, আমার এক শিষ্য আসিয়া বলিল, 'গুরুদেব, একটি রমণী আপনার সাক্ষাৎকামনা করিতেছে।' আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া দেখিলাম, কুবলয়ার সেই পেটিকাবাহী পরিচারিকা। আমি রমণীর মুখের দিকে চাহিতে সে বলিল, 'নিষ্ঠুর যুবক, ত্বদগতপ্রাণা কুবলয়া তোমার অদর্শনে মৃতপ্রায়, এস, একবার শেষ দেখা দিয়া যাও।' আমি কিছু বলিতে পারিলাম না, তাহার সহিত

উন্মত্তের মতো ছুটিলাম। কত নদী বন পর্বত প্রান্তর নিমিষে অতিক্রম করিতে লাগিলাম, পদ কাটিয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, রক্তে পদ রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, ভ্রূক্ষেপ নাই। ঐ দেখা যায় পুলস্ত্যপুরী! চরণ অধিকতর দ্রুত চলিল। নগরের বহু পথ অতিক্রম করিয়া পারাবত ভবনের উদ্যান প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বিন্ধ্য-গিরির একটি নির্ঝর কৃত্রিম উপায়ে সেই উদ্যান দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল; তাহাতে পদবিক্ষত শোণিত ধৌত করিয়া অট্টালিকায় প্রবেশ করিলাম। অতি বৃহৎ অট্টালিকা জনশূন্য আলোকশূন্য—মহাশ্মশানের মতো বিরাট ভয়ঙ্কর বোধ হইল। ত্রিতলে আসিলাম। একটি পরিচারিকা গলদশ্রুলোচনে বলিল, "বড় বিলম্ব করিয়াছ, নিষ্ঠুর ব্রহ্মচারী। কুবলয়া মরিয়াছে। তাহার শেষ শ্বাসে তোমারই নাম উচ্চারণ করিয়া সে মরিয়াছে।"

কুবলয়া মরিয়াছে! আমিই তবে তাহার মৃত্যুর কারণ! আমি পাষাণবৎ নিশ্চল; আমার গাঢ় শোকের বাহ্যবিকাশ বুঝি অসম্ভব। আমার পূর্ব্বপরিচিতা পরিচারিকা আমার হাত ধরিয়া আমাকে এক ঘরে লইয়া গেল। সেই ঘরে ছিল

মৃত্যুসমাচ্ছন্ন কুবলয়া। একখানি অতি পাতলা গোলাপী রঙের কাপড় দিয়া কুবলয়ার দেহ আবৃত; পার্শ্বে একটা বড় বাতি কাঁপিয়া কাঁপিয়া জলিতেছিল। আহা! কুবলয়ার সে কান্তি নাই, সে লাবণ্য নাই, সে স্ফূর্তি নাই, সে প্রাণ নাই—তবু কত সুন্দর! ধরণীর সুপ্ত শোভার উপর ঊষার কোমল জ্যোতির আবরণে যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, বস্ত্রাবৃত কুবলয়ার দেহে সেই সৌন্দর্য্য দেখিলাম। কুবলয়ার কেশে একটি গোলাপ সন্নদ্ধ রহিয়াছে,—তাহাতে একটি মাত্র পাপ্‌ড়ি খসো-খসো হইয়া আছে, বাকিগুলি শয্যায় বিক্ষিপ্ত পড়িয়াছে। আমি ধীরে ধীরে তাহার নিকটে গেলাম, পাছে কুবলয়ার সুখসুপ্তি টুটিয়া যায়। বহুক্ষণ তাহাকে দেখিলাম। কি সরল মুখশ্রী, কি প্রেমপূর্ণ হৃদয়খানি! কে বলে কুবলয়া কলঙ্কিনী ছিল? সে আজ প্রেমের মধ্য দিয়া, মৃত্যুর ভিতর দিয়া, অগ্নিতে স্বর্ণের মতো উজ্জলতর, পবিত্র হইতেও পবিত্রতর! কাতরকণ্ঠে বলিলাম, উঠ উঠ; প্রেয়সি! নয় ত তোমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া মরিবার অধিকার দাও।' আমি জানু পাতিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। আমি তাহার মৃত্যুমূক মুখের উপর

চুম্বন করিলাম। অমনি কুবলয়া আমার কণ্ঠ বাহুবেষ্টনে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, 'হে প্রিয় প্রেমিক, প্রেম মৃত্যুঞ্জয়! সত্যবান প্রেমের বলে মৃত সাবিত্রী ভগবতীকে ফিরিয়া পাইয়াছিল। তোমার একাগ্র প্রেম আমার প্রাণে অমৃত নিষেক করিয়াছে। জরা ব্যাধি মরণ অন্তর্হিত হইয়াছে। হে আমার সর্ব্বমঙ্গলাশ্রয়,আমাদের উভয়ের হৃদয়ে যে প্রেমের গ্রন্থি পড়িয়াছে,তাহা ইহপরকালে খুলিবে না। হে সুন্দর, হে আমার আদর্শ-পুরুষ, তোমায় আমি না দেখিয়াই ভালো বাসিয়াছিলাম। তোমায় আমি বহু স্থানে বহুদিন হইতে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। তোমায় আমি স্বপ্নে দেখিতাম, তোমায় আমি অনুভব করিতাম। তারপর সেই শুভ ও অশুভ দিনে তোমায় চাক্ষুষ দেখিলাম! সেইদিন তুমি আমার নিকটে আসিয়াও অতি দূরে চলিয়া গেলে,—তোমার আমার প্রাণের ব্যাকুলবিদ্রোহ লৌকিক রীতি বারণ করিতে পারিল না। তাহাতে কী হইয়াছে? তোমায় ভালোবাসিয়া বুঝিয়াছি, দেহের মিলন মহামিলনের আবর্জনা মাত্র। আমাদের জন্মজন্মান্তরের মিলনের বিরহ ঘটায় এমন কে আছে? হে সুন্দর, তোমার অঙ্গ হইতে ছাগ কাবার বস্ত্র

টানিয়া ফেল। তুমি আমার হৃদয়ের অধিরাজা, এস রাজ-পরিচ্ছদে তোমায় সাজাইয়া দি'।

কুবলয়া আমায় বেশ পরিবর্ত্তনে সাহায্য করিতে লাগিল। আজন্ম বনবাসী আমি, প্রচুররূপে অনাবশ্যক পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করিতে অনিবার্য্য ভুল করিয়া কুবলয়ার তীক্ষ্ণ মধুর হাস্যের কারণ হইতে লাগিলাম। অবশেষে কুবলয়া আমার সম্মুখে একখানি দর্পণ ধরিয়া বলিল, 'দেখ দেখি, আমি কি উচ্চ আদর্শের সুন্দর পুরুষ কল্পনা করিয়া আযৌবন হৃদয়ে রাখিয়াছি।'

উঃ, আমি এত সুন্দর! ব্রহ্মচারী আমি, কখনো নিজ-মূর্ত্তি না দেখিলেও আমার বিশ্বাস আমি কখনো এত সুন্দর নহি। কুবলয়ার প্রেমদৃষ্টিই আমাকে সুন্দরতর মধুরতর করিয়াছে! আমি কুবলয়াকে টানিয়া লইয়া বক্ষে ধরিলাম, —কুবলয়া আমাতে মিশিয়া গেল।

আমার সতীর্থ জাজালি ডাকিতেছেন, 'ইন্দ্রভূতি, ইন্দ্রভূতি।' আমি চমকিয়া দেখিলাম, জাজালি আমার শয্যাপার্শে বসিয়া ডাকিতেছেন; শিষ্যমণ্ডলী চিন্তাকুল মুখে চারিদিকে দণ্ডায়মান! আমি বলিলাম, 'একি, কি হইয়াছে?'

সকলের কথা হইতে সার সংগ্রহ করিয়া বুঝিলাম, আমি চারিদিন যাবত অজ্ঞান ছিলাম। আশ্রমসন্নিহিত উদ্যানে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া ছিলাম, শিষ্যগণ কুটীরে আনিয়া আজালিকে ডাকিয়া আনিয়াছে। তখন আমার সকল কথা মনে পড়িল। আমি লজ্জিত হইয়া আজালির সহিত অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। কথাপ্রসঙ্গে আজালি বলিলেন, 'রাজনর্ত্তকী কুবলয়ার চারিদিন হইল মৃত্যু হইয়াছে। কি এক অজ্ঞাত চিন্তায় নির্জ্জনবাসে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া সে মৃত্যুলাভ করিয়াছে। রাজা পর্য্যন্ত তাহার প্রাসাদে প্রবেশলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। বোধ হয় তাহার হঠাৎ ধর্ম্মভাব প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সে তাহার সমস্ত সম্পত্তি আমাদের ও অন্যান্য আশ্রমকে, এবং পারাবত-ভবন তোমার আশ্রমকে দিয়া গিয়াছে। সে মৃত্যুকালে নাকি বলিয়াছিল, নিষ্ঠুর যুবক, আমার পূজা এজন্মে গ্রহণ করিলে না, পরজন্মে গ্রহণ করিতে হইবে। কুবলয়ার প্রাণময় প্রেম ব্যর্থ হইবে না'। এই কথা শুনিবামাত্র আমি আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। কয়দিন অজ্ঞান ছিলাম জানি না। জ্ঞান লাভ করিয়া দেখিলাম, আমি আচার্য্যের

আশ্রমে আসিয়াছি। আমার বুকের ধন স্বর্ণপেটিকাটি সর্বসমক্ষে উন্মুক্ত পড়িয়া রহিয়াছে; চিত্রগতা কুবলয়াকে দেখিয়া লজ্জা ও শোকে আমার চক্ষু বাহিয়া জল পড়িল। আচার্য্য নিষ্ঠুর নিয়তির মতো বজ্রনির্ঘোষে বলিলেন, 'বৎস ইন্দ্রভূতি, ঐ স্বর্ণপেটিকা তমসার জলে নিক্ষেপ করিয়া আইস। "পারাবত ভবন" ভগ্ন করিয়া দেবমন্দির নির্ম্মিত হইবে। সে ভারও তোমার উপর।'

আচার্য্যের আদেশের দ্বিরুক্তি করা আমার সাধ্যাতীত। আমি তো আমার সুখ নিজহাতে তমসার জলে নিক্ষেপ করিতে চলিলাম, কিন্তু ব্রাহ্মণ, তুমি কি নিষ্ঠুর! মানব-হৃদয়ের কোমলতা দয়া মমতা কি তোমাতে নাই? পেটিকা তমসাগর্ভে বিসর্জ্জিত হইল। কুবলয়ার বাসভবন আমার চক্ষের সমক্ষে আমারই আজ্ঞায় ভগ্ন হইতে লাগিল। গৃহের এক-একখানি ইষ্টক প্রস্তর আমারই শরীরের অস্থি-গুলির মতো খসিয়া পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সব শেষ হইয়া গেল। তৎপরে সেখানে নির্ম্মিত হইল এক উচ্চচূড় মন্দির,—এবং তাহাতে স্থাপিত হইল এক সরস্বতীমূর্ত্তি।

তখন আচার্য্য আদেশ করিলেন, আমাকে অগস্ত্যাশ্রমে যাইতে হইবে। সহিষ্ণুতার সীমা আছে; আমার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। আত্মসংযম করিয়া বলিলাম, 'আমার চিত্ত দুর্ব্বল হইয়াছে, আপনার শ্রীচরণ হইতে দূরে পাঠাইবেন না।' এ কথায় ছল ছিল কি না ঠিক বলিতে পারি না। আমার অনুনয়ে আচার্য্য সদয় হইয়া সরস্বতী-মন্দিরে আমার স্বাধীন আশ্রম করিতে আদেশ দিলেন।

আমার নিকট কুবলয়া মরিতে পারিল না। জগতের প্রতি সৌন্দর্য্যকণায় তাহারই রূপের ছায়া দেখিতাম। দেখিতাম, সমগ্র রমণীসমাজ মাতৃত্বে দুহিতৃত্বে কুবলয়ার প্রেমের অনুকরণ করিতেছে। কুবলয়াকে ভালোবাসিয়াছিলাম বলিয়া আমার নীরস কঠোর প্রাণ বিশ্ব-সংসারকে প্রেম দিতে শিখিল। একের ভালোবাসা বহুতে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

এদিকে প্রতি রাত্রিতে মন্দির 'পারাবত-ভবনে' পরিণত হইত, আর সরস্বতী হইত আমার কুবলয়া। তাহার বীণা হইতে প্রণয়গীতি ধ্বনিত হইত, তাহার হস্তের পুস্তকে প্রেমানুপ্রাণিত শ্লোক পাঠ করিতাম। সে আমার নিত্য

নূতন জ্ঞানরত্নের অধিকারী করিত, নিত্য নূতন ললিতকলার অভিজ্ঞতা দিত। সরস্বতী আমার প্রেমপ্রাণা জ্ঞানদাত্রী স্বপনয়া, আমি তাহার নিত্য-উপাসক ইত্যপ্রভৃতি। ভোরের বাতাস বহিতে আরম্ভ করিলে স্বপনয়া পাষাণী হইয়া পাষাণবেদিকায় উঠিয়া বসিয়া খালি হাসিত, আমি তাহার দীনভক্ত সমস্ত দিন তাঁহার পদতলে বসিয়া নানাশাস্ত্রের আলোচনা করিতাম। আজও, আমি সেইরূপ দিনে নানাশাস্ত্রপারদর্শী অধ্যাপক ব্রহ্মচারী পরসেবারত, রাত্রে আমি স্বপনয়ার প্রেম-স্বপনী দীন উপাসক। ইহা—

"স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু"।

শেষ